সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

জুন ২০১৭

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭

বিশেষ যোগ সংখ্যা

০১. ০২ মে ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে ঢাকায় তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকে উন্নয়ন সহযোগিতাসহ বিভিন্ন দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়

০২. ২২ মে ২০১৭ হাই কমিশনার ঢাকায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস ট্রেইনি অফিসারদের ২২তম ব্যাচের সদস্যদের মতবিনিময়কালে ভারতের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক; ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বিষয়ে আলোকপাত করেন

০৩. ২৩ মে ২০১৭ ভারতীয় হাই কমিশনার জাতীয় প্রেস ক্লাবে কূটনৈতিক সংবাদদাতাদের সংগঠন ডিক্যাব, বাংলাদেশ আয়োজিত 'ডিক্যাবটক' শীর্ষক সভায় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন

০৪. ২৪ মে ২০১৭ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ঢাকায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসায় ফোরামের বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আবদুল মাতলুব আহমেদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন

০৫. ২৮ মে ২০১৭ হাই কমিশনার ঢাকায় ২১ জুন ২০১৭-য় অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭-এর প্রস্তুতি দেখতে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে যান

০৬. ২৮ মে ২০১৭ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকায় ভারতীয় সিইও ফোরাম-এর এক মতবিনিময় বৈঠকের আয়োজন করে

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ পঁয়তাল্লিশ | সংখ্যা ০৬ | জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪২৪ | জুন ২০১৭

Website: **www.hcidhaka.gov.in**
/IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

ভারতীয় ভেষজ গাছ-গাছড়া

পৃষ্ঠা: ৪৪

কর্মযোগ	'বিয়ন্ড সামিট্রিজ'-এ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা	০৪
	দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণে প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্স	০৬
বাণী	আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী	০৭
প্রচ্ছদ রচনা	আন্তর্জাতিক যোগ দিবস	০৮
	বাংলাদেশে যোগচর্চা ও এর প্রেক্ষিত ॥ মোহাম্মদ হারুন	১০
	যোগ কী এবং কেন? ॥ দীপেন সেনগুপ্ত	১২
	যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে ॥ মথুরানাথ কুণ্ডু	১৪
	গর্ভাবস্থায় যোগ ॥ তৃপ্তি মেহতা দেশপাণ্ডে	১৭
	আসুন যোগানুশীলন করি ॥ বিরদ রাজারাম যাজ্ঞিক	২০
	যোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য ॥ রাউফুন নাহার	২২
	যোগবলে রোগ-আরোগ্য ॥ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী	২৪
	যোগসাধনের গুরুত্ব ॥ প্রমিথিয়াস চৌধুরী	২৯
ধারাবাহিক	তর্পণ ॥ ঋতা বসু	৩০
উচ্চশিক্ষা	বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ	৩৪
প্রবন্ধ	খুলবে কেনে সে ধন ও তার গাহেক বিনে মিলন সরকার	৩৫
রাজ্য পরিচিতি	সিকিম	৩৮
ভেষজ	ভারতীয় ভেষজ গাছ-গাছড়া কৃষিবিদ সিদ্দিকুর রহমান	৪৪
কবিতা	সত্যজিৎ বিশ্বাস ॥ সুমী সিকান্দার রমা সরকার ॥ দুলাল সরকার	৪৬
	জহরলাল মজুমদার ॥ শাহীন রেজা গোলাম কিবরিয়া পিনু ॥ অনীক মাহমুদ	৪৭
শেষ পাতা	প্রমথনাথ বিশী	৪৮

০৭ থেকে ২৯

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এই দিনটিকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে বেছে নিয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। যোগ হলে প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত এক বিশেষ ধরনের শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা। এর উদ্দেশ্য হল মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিধান। এই প্রথা ভারতে আজও প্রচলিত। ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণদানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দেন। সে বছরেরই ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

সম্পাদক **নান্টু রায়**
ফোন ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স: ১২৩৯
e-mail: editor.bb@hcidhaka.gov.in

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন ৯৫৬২১৯৮

প্রকাশক ও মুদ্রাকর **ভারতীয় হাই কমিশন**
বাড়ি ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই।
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

ভারতের দর্পণ

ভারত বিচিত্রা আমার একটি প্রিয় পত্রিকা, যা দীর্ঘ ১৯৮১ সাল থেকে পড়ে আসছি এবং আমার সংগ্রহেও আছে। এক সময় আমার নামে *ভারত বিচিত্রা* পাঠানো হত। দীর্ঘ বছর ধরে ভারত বিচিত্রার সঙ্গে আমার নাড়ীর বন্ধন। সেই সূত্রে *ভারত বিচিত্রা* সম্পাদকের হাত বদল হতে দেখেছি। দেখেছি পত্রিকাটির কাগজের মান উন্নয়ন। সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধন এই *ভারত বিচিত্রা*, যার মাধ্যমে প্রতিবেশী বিচিত্র সংস্কৃতির দেশ ভারত সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। জানতে পারি ভারতের আধুনিক প্রযুক্তি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, পর্যটন, কৃষি, চলচ্চিত্র, স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিঝরা দিনের সংগ্রামী ব্যক্তিদের পরিচয়, মহাকাশ গবেষণা, তীর্থক্ষেত্রসহ আরো বহু বিষয়ে। তবে ইদানীং চলচ্চিত্র, খেলাধূলা, তীর্থ ভ্রমণসহ আরো কিছু বিষয় ভারত বিচিত্রায় অনুপস্থিত থাকছে। আমি মনে করি *ভারত বিচিত্রা* ভারতের একটি দর্পণ। *ভারত বিচিত্রা* পড়া মানে চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভারতের নানা দিকের চিত্র। ব্যক্তিজীবনে শিক্ষকতার পাশাপাশি একটু লেখালেখিও করে থাকি। তাই আপনাদের সুবিবেচনার জন্য একটা কবিতা পাঠালাম।

চিত্তরঞ্জন মল্লিক
গ্রাম– হোগলবুনিয়া, ডাকঘর– বটিয়াঘাটা
উপজেলা– বটিয়াঘাটা, খুলনা

কেউ কথা রাখেনি

কথায় আছে বিপদে বন্ধুর পরিচয়। ১৯৭১ সালে ভারত সেই প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় দিয়েছে। শুধু বন্ধুত্বের পরিচয় নয়, আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ইতিহাসে ভারতের অবদান চির অম্লান হয়ে থাকবে। ভারত আমাদের কাছে তাই মহাভারত। ভারতকে জানার, দেখার প্রবল ইচ্ছে আমার মত অনেক বাংলাদেশির মনের সুপ্ত বাসনা। এ বাসনার একআনা হলেও পূরণ হয় *ভারত বিচিত্রা* পাঠের মাধ্যমে। তাছাড়া, *ভারত বিচিত্রা* ভারতের এক মহৎ সৃষ্টি। সাহিত্য সংস্কৃতির এমন উদার পৃষ্ঠপোষক পৃথিবীতে বিরল। বিশেষ করে এমন মূল্যবান সুদৃশ্য পত্রিকা প্রকাশ করে বিনামূল্যে তা বিতরণ করা ধনের ব্যাপার নয়, পুরোটাই মনের ব্যাপার। ভারত কত সুন্দর কত মনোরম তা *ভারত বিচিত্রা* দেখলে অনুমান করা চলে। আমি মাঝেমধ্যে যখন পুরনো কোন পত্রিকা হাতে পাই, মুগ্ধ হয়ে পড়ি। আমার এক লেখক বন্ধুর কাছে ২ কপি পত্রিকা আসে; সে আমাকে আমার পাঠাগারের জন্য ১কপি দিতে চেয়েছিল কিন্তু সে বন্ধু কথা রাখেতে পারেনি। চিঠি লিখি, আবেদন জানাই, মেইল পাঠাই। নাদের আলির কাছে খবর লই। প্রতীক্ষায় বসে থাকি। কিন্তু *ভারত বিচিত্রা* আসে না। তেত্রিশ বছর কাটল। কেউ কথা রাখেনি।

তৌহিদ-উল ইসলাম, সম্পাদক
রংধনু পাঠাগার, চন্দ্রখানা (শাহবাজার)
ডাকঘর ও উপজেলা– ফুলবাড়ি, জেলা– কুড়িগ্রাম

ভ্রান্ত ধারণা দূর হবে

১৯৮৭ সালের ঘটনা। এসএসসি পাশ করে মংমনসিংহ জেলা সদরের নামকরা একটি বেসরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হই। একদিন কলেজ গেটে ঢাকাস্থ *বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের* একটি বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য 'বই পড়া প্রতিযোগিতা'।

আমি এমন এক পরিবারে বেড়ে উঠি যেখানে পাঠ্যবইয়ের বাইরের যে কোন বইকে বলা হত 'আউট বই'। এগুলো পড়া তো দূরের কথা ধরাও নিষেধ ঐ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্যে আমাকে বেশ কিছু 'আউট বই' পড়তে হয়েছিল। পরে সেগুলোর উপর লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেশ কিছু বই পুরস্কার পেয়েছিলাম। পুরস্কার হিসেবে পাওয়া বইগুলোর মধ্যে একটি ছিল *নন্দিত নরকে*। লেখক হুমায়ূন আহমেদ। এই প্রথম চিনলাম বাংলা সাহিত্যের এই জনপ্রিয় লেখককে যিনি আমার মত অসংখ্য পাঠক তৈরি করেছেন।

ভারত বিচিত্রার আগস্ট ২০১২ সংখ্যার প্রচ্ছদে এই জননন্দিত লেখকের ছবি দেখে বিমুগ্ধ হলাম। ভারতের বিশেষ করে কলকাতার লেখকদের সম্পর্কে এদেশের সাধারণ পাঠকদের কিছু ভ্রান্ত ধারণা আছে। এই সংখ্যাটি যারা পড়বেন তাদের সে ভ্রান্ত ধারণাগুলো দূর হবে। ধন্যবাদ *ভারত বিচিত্রাকে*। চির কৃতজ্ঞ *ভারত বিচিত্রার* কাছে।

লুৎফর কামারিয়া
চাড়িয়া বাজার-২৪১১
তারাকান্দা, ময়মনসিংহ

আরও জানতে

আজ থেকে বছর সাতেক আগে 'ওয়ার্ল্ড রেডিও লিসেনার্স ক্লাব' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলি। আমাদের এই ক্লাবের উদ্দেশ্য সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রেডিও কেন্দ্রগুলোর অনুষ্ঠান শোনার পাশাপাশি ঐ দেশের জনগণের জীবনযাত্রা, কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। এর বাইরে আমরা বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করি। যেমন নিরক্ষর মুক্ত সমাজ গঠন, বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধ, গাছ লাগান ইত্যাদি। আমরা ভারতের অল ইন্ডিয়া রেডিওর বাংলা, ইংরেজি অনুষ্ঠানমালা শুনে থাকি। এই বেতারের মাধ্যমে আমরা ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি। ভারত সম্পর্কে আরো জানতে *ভারত বিচিত্রার* বিকল্প নেই, পত্রিকাটি পড়ে আমাদের এমন বিশ্বাস জন্মেছে।

মো. জাহাঙ্গীর আলম সভাপতি
ওয়ার্ল্ড রেডিও লিসেনার্স ক্লাব
গ্রাম– বিনোদপুর, ডাকঘর– মচমইল
থানা– বাগমারা, রাজশাহী

অপেক্ষার প্রহর

অপেক্ষার প্রহর যেন ফুরোয় না– কবে *ভারত বিচিত্রা* আসবে। কখনো পোস্ট অফিসের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা আবার কখনো পিয়নকে বিরক্ত করার যেন কমতি নেই। হঠাৎ পাঠাগারের দরজা খুলেই দেখা যায় চৌকাঠের ফাঁকা দিয়ে রাখা *ভারত বিচিত্রা*। বইখানা পেয়ে অধীর আগ্রহের অপেক্ষায় থাকা মনটা আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। দুঃখের বিষয় ২০১৬ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, জুন, জুলাই এই সংখ্যাগুলো আমাদের কাছে পৌঁছয়নি। ইতোপূর্বেও আপনার বরাবর অনুরোধ করেছিলাম এ সংখ্যাগুলো

পাঠানোর জন্য। আবারও অনুরোধ করছি যদি এই সংখ্যাগুলো আপনাদের সংগ্রহে থাকে তাহলে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে চিরঋণী করবেন।

অন্যদিকে *ভারত বিচিত্রার* পৃষ্ঠা কেটে ইংরেজি ব্লক লেটারে ঠিকানা লিখে দ্রুত পাঠানোর কথা বলেছেন। আমরা এমন মূল্যবান বইটির পৃষ্ঠা না কেটে পাঠাগারের প্যাডে ঠিকানা লিখে পাঠালাম।

নিরঞ্জন মিত্র
সভাপতি, শ্রী শ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন পাঠাগার
গ্রাম+ ডাকঘর– উত্তর সোনাখালী
উপজেলা– মঠবাড়িয়া, পিরোজপুর

আকাঙ্ক্ষা উজিয়ে উঠল

১৯৯৮ সাল থেকে *ভারত বিচিত্রার* পাঠক আমি। বলা যায় আমার নিত্যসঙ্গী ছিল *ভারত বিচিত্রা*। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো বইয়ের দোকান, স্টেডিয়াম মার্কেট, রাজশাহীর সাহেব বাজারের পুরনো বইয়ের দোকান– এ-সব জায়গা থেকে ৫ টাকা দিয়ে এক-একটা *ভারত বিচিত্রা* কিনতাম। পছন্দ হলে একসঙ্গে অনেকগুলোও নিতাম। কখনো আবার কোন কোন স্যারের রুমে গেলে নতুন সংখ্যা দেখে লোভ হত, হাতে নিয়ে যতটা পড়া যায় পড়তাম। অনেকবার লিখতে চেয়েছি, পেতে চেয়েছি *ভারত বিচিত্রা*, কিন্তু হয়নি। অনেকদিন পর, কয়েকদিন আগে বাগেরহাটের এক আইনজীবীর ব্যক্তিগত চেম্বারে আবিষ্কার করলাম *ভারত বিচিত্রার* জুলাই ২০১৩ সংখ্যা, অত্যন্ত প্রিয় পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষকে নিয়ে যার প্রচ্ছদ প্রতিবেদন। ভেতরে দেখলাম আকর্ষণীয় কিছু লেখা। নতুন করে আকাঙ্ক্ষা উজিয়ে উঠল। পাঠক হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তো বটেই, লেখক হিসেবে লেখার বাসনাও। নিয়মিত হাতে পাওয়ার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না, তবে পেলে কৃতজ্ঞ থাকব।

কুমার দীপ, প্রভাষক
সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ
বাগেরহাট

সম্পাদকীয়

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৯তম পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগানুশীলনের উপকারিতা সম্পর্কে বিশ্ববাপী সচেতনতা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এক সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

যোগানুশীলন একটি প্রাচীন জীবনাচরণ পদ্ধতি যার মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেছিলেন, শুধু পার্থিব চিকিৎসা ব্যক্তির শরীরের ব্যাধির কিছু উপশম করলেও তাঁর সার্বিক কল্যাণের জন্যে অপার্থিব কিছু প্রয়োজন। যোগ হচ্ছে পার্থিব-অপার্থিবের সেই আশ্চর্য সম্মিলন যার মধ্য দিয়ে মানুষ শরীরে ও মনে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। এই চিকিৎসা পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে খ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়ায় ও প্রায়োগিক প্রতিক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই যোগের উদ্ভব ঘটেছিল। বৈদিকযুগে যোগের বহুল প্রচার ছিল এবং বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণের একটি বড় অংশ পুড়ে আছে যোগ ও ধ্যান। অতি প্রাচীনকালেই যোগ চিন জাপান তিব্বত ও অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে।

পৃথিবীর সর্বত্রই আজ যোগ অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে যোগের মূল নিহিত হলেও আজ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও সমাজের জীবনে যোগ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় এখন যোগ-সাহিত্য পাওয়া যায়। যোগ এখন বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ও কুশল-শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

মনে রাখতে হবে, যোগ কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এবং এটি কোনভাবেই হিন্দু ধর্মের সোপান নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক, প্রক্রিয়ামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত একটি চর্চিতব্য বিষয়। যোগের সঙ্গে কোন ধর্মেরই কোন বিরোধ নেই বরং এটি বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যোগে কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় না বরং এতে মন বন্ধনহীন উন্মুক্ত হয়। দেহ মন ও প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য এনে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই যোগের লক্ষ্য। যোগ মানুষের চেতনার সীমাহীন প্রসার ঘটায় ফলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধিত হয়।

২১ জুন ২০১৭-কে সামনে রেখে চলতি সংখ্যায় যোগের ওপর প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির বাণীসহ ১০টি প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করা হল। এতে যোগপিপাসু মানুষ যোগ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

‘বিয়ন্ড সামিট্রিজ’-এ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

১৬ মে, ২০১৭ ঢাকায় বাংলাদেশ হেরিটেজ ফাউন্ডেশন আয়োজিত ‘বিয়ন্ড সামিট্রিজ’-এ বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক সফল ভারত সফর শীর্ষক সম্মেলনে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, ‘ভারত ও বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূগোল ও ভাষাগত গভীর বন্ধন রয়েছে এবং দুই দেশের মধ্যে এই সম্পর্ক সভ্যতাগত। এরই প্রেক্ষিতে ভারতে ৭-১০ এপ্রিল ২০১৭ সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাষ্ট্রীয় সফরটির, যেটি দীর্ঘ ৭ বছর পর অনুষ্ঠিত হয়েছে, পর্যালোচনা দরকার। ২০১৫ সালের জুনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরের পর থেকে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নতুন সহযোগিতার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে এবং ২০১৫ সালে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে। এই বিষয়গুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর ছিল একটি সুযোগ। প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর আমাদের সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং দুই প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত যৌথ বিবৃতি নিশ্চিত করেছে যে, ‘ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যেকার সম্পর্কগুলি ভ্রাতৃ বন্ধনের ভিত্তি করে রচিত এবং সার্বভৌমত্ব, সমতা, বিশ্বাস ও সমঝোতার ভিত্তিতে একটি সার্বিক অংশিদারিত্বের প্রতিফলন যা কৌশলগত অংশিদারিত্বকে অনেকটাই ছাড়িয়ে গেছে।’ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষ্য অনুযায়ী ‘আমাদের সম্পর্কে একটি সোনালি অধ্যায় সূচিত হয়েছে।’’

হাই কমিশনার বলেন, ‘স্থল ও সমুদ্রসীমা চুক্তিসমূহের সফল বাস্তবায়ন আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথ সুগম করেছে এবং আমাদের সহযোগিতা শক্তি সামর্থ্য বাড়ছে। বাকি অঞ্চলের অনুসরণের জন্য একটি নমুনা সম্পর্ক নির্মাণে আমরা একটি দারুণ অবস্থানে আছি। শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই নয় আমাদের সম্পর্ক হচ্ছে দুটি দেশের জনগণের মধ্যে ‘বন্ধুত্বের’ সম্পর্ক।

‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই সম্পর্ককে উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য তাঁর ব্যক্তিগত গভীর শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মরণে দিল্লির প্রাণকেন্দ্রে একটি সড়কেরও নামকরণ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীর হিন্দি অনুবাদ উদ্বোধন করেন। উভয় দেশই বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম নিয়ে যৌথভাবে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা করছে যেটি ২০২০ সালে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মুক্তি পাবে।

‘মুক্তিযুদ্ধে প্রাণদানকারী ভারতীয় সৈন্যদের পরিবার পরিজনদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মান জানানো ছিল এক বিশেষ শুভেচ্ছার নিদর্শন যা ১২৫ কোটি ভারতীয় জনগণের হৃদয় স্পর্শ করে। আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকারও মূল্যায়ন করেছি যা আমাদের সম্পর্ককে দৃঢ় করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরসুরীদের জন্য অতিরিক্ত ১০০০০ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান (বাংলাদেশী টাকায় যার মূল্যমান ৪৬ কোটি); প্রতিবছর ১০০ মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় হাসপাতালগুলোতে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান; এবং মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দীর্ঘ পাঁচ বছরের মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা প্রদানের ঘোষণা দেন।

‘সম্পর্ক এগিয়ে নিতে উভয় পক্ষের বিপুল রাজনৈতিক আগ্রহ রয়েছে। ভারত বাংলাদেশের একটি অঙ্গীকারাবদ্ধ উন্নয়ন অংশীদার এবং আমরা বাংলাদেশকে সহজ শর্তে ৮শো কোটি মার্কিন ডলার ঋণ প্রদানের অঙ্গীকার করেছি। সফরকালে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রদত্ত ৩শো কোটি মার্কিন ডলার ঋণরেখার অতিরিক্ত ৫শো কোটি মার্কিন ডলার সহজশর্তে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এটি হচ্ছে ভারত প্রতিশ্রুত কোন একক দেশকে দেওয়া বৃহত্তম অংকের ঋণ যা প্রমাণ করে যে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে যথার্থ মূল্যায়ন করি এবং সর্বোচ্চ প্রাধান্য দিই।’

তিনি বলেন, ‘এই সফরে রেকর্ডসংখ্যক ৩৬টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে যা কোন একক সফরে কোন দেশের সঙ্গে ভারতের স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সফরকালে যে ২২টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল সেগুলি মিলিয়ে আমরা বলতে পারি যে দুই বছরে সাকুল্যে ৬০টি দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে যা কোনও ছোট অর্জন নয়। এটি আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের বিস্তৃতি ও গভীরতা এবং অপার সম্ভাবনার কথা বলে যা এখনও আমাদের সহযোগিতার মধ্যে রয়েছে যা আমাদের সমাজকে বদলে দিতে পারে এবং আমাদের দুই দেশের জনগণের উন্নয়ন ঘটাতে পারে।

‘উপরন্তু, এই চুক্তিগুলোর অধিকাংশই নতুন চুক্তি এবং শুধুমাত্র বিদ্যমান চুক্তিগুলোর নবীকরণ নয়। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ১৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ভারতীয় সরকারি ও বেসরকারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে যেগুলি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, লজিস্টিকস, শিক্ষা ও চিকিৎসাখাতে নতুন করে ১ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ আনবে। মংলা, ভেড়ামারা এবং মিরসরাইয়ে নির্মিতব্য ভারতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক জোনগুলোও বাংলাদেশে ভারতীয় বিনিয়োগ সহজতর করবে। আমরা প্রধান প্রধান কিছু ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প যেমন ‘স্মার্ট সিটিজ’, ‘মেক উইথ ইন্ডিয়া’, ‘নমামি গঙ্গা প্রকল্প’ ইত্যাদিতে লব্ধ আমাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে চাইছি। আমরা জ্বালানি দক্ষতা বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছি এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে ১০,০০০ উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এলইডি বাল্ব লাগানোর পরিকল্পনা করেছি যার কাজ এখন চলছে। নতুন ঋণরেখার আওতায় আমরা যৌথ ভাবে বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পও হাতে

২৯ মে ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশের এভারেস্টজয়ী মুসা ইব্রাহিমকে পাপুয়া নিউগিনির কার্সটেনজ পর্বতে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী অভিযানে শুভেচ্ছা জানান

নেবো। ভারতে আমাদের একটি স্মার্ট সিটিজ প্রকল্প রয়েছে এবং আমরা রাজশাহী, খুলনা ও সিলেটে নগর উন্নয়ন প্রকল্পে সহযোগিতা করতে চাই; আমরা বাংলাদেশে ৩৬টি কম্যুনিটি ক্লিনিক নির্মাণ করতে যাচ্ছি। আমরা শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়নে নয় বরং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে অংশীদারিত্ব চাইছি যা জনগণের জন্য বাস্তবভিত্তিক কল্যাণ বয়ে আনবে এবং আমরা ভারতে এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পেরে আনন্দিত।

'সমগ্র উপ-অঞ্চলে প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হওয়ার সম্ভাবনা বাংলাদেশের রয়েছে। যোগাযোগ আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। এটি আমাদের নিজস্ব প্রতিবেশীত্বমূলক প্রথম নীতির অংশ এবং পাশাপাশি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও প্রবৃদ্ধি উভয় দেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। দুই প্রধানমন্ত্রী রাধিকাপুর ও বিরলের মধ্যে চতুর্থ রেলওয়ে সংযোগ (আগের ছয়টি রেল সংযোগের মধ্যে) উদ্বোধন করেন। ২০১৮ সাল নাগাদ আরও তিনটি রেললাইন সংযোগের কাজ শেষ হবে। ঢাকা ও কলকাতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী মৈত্রী এক্সপ্রেস এখন পূর্ণ শীতাতপনিয়ন্ত্রিত যাত্রী সেবা দিচ্ছে এবং এবছর আগস্ট মাস থেকে বেড়ে সপ্তাহে চারদিন চলাচল করবে। দুটি শহরের মধ্যে ভ্রমণের সময়সীমা ব্যাপকহারে কমিয়ে এটি নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রদান করবে। খুলনা ও কলকাতার মধ্যে চলাচলের জন্য একটি নতুন মৈত্রী এক্সপ্রেস চালু করার কাজ চলছে, ইতোমধ্যে এটির পরীক্ষামূলক চলাচল সম্পন্ন হয়েছে। যাত্রী চলাচল আরও সহজ করার জন্য কলকাতা-ঢাকা-আগরতলা এবং ঢাকা-শিলং-গৌহাটি ছাড়াও খুলনা ও কলকাতার মধ্যে একটি নতুন বাস সার্ভিস চালু করা হয়েছে।

'পণ্য ও জনগণের চলাচলের জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথের সম্ভাবনাকে অপেক্ষাকৃত কম কাজে লাগানো হয়েছে। তবে কলকাতা ও পানগাঁওয়ের মধ্যে পণ্য পরিবহন শুরু এবং কন্টেইনার সার্ভিস চালু করা গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। এই সফরে যাত্রী ও ক্রুজ প্রটোকল বিষয়ে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকসমূহ এবং নাব্যতা সহযোগিতা অবশ্যই নৌ চলাচলে গতিবেগ আনবে।

২২ মে ২০১৭ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা কিংবদন্তী সংগীতশিল্পী প্রয়াত শ্রী শ্যামল মিত্রের পুত্র প্রখ্যাত গায়ক শ্রী সৈকত মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে প্রয়াত শ্যামল মিত্রের গান খুব জনপ্রিয় হয়েছিল

'বাণিজ্য: আমরা বাংলাদেশকে পূর্ণ বাজার প্রবেশাধিকার দিয়েছি। সীমান্ত হাটগুলি সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবিকার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হয়েছে এবং এই সফরে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় আরও সীমান্ত হাট স্থাপন করা হবে। সীমান্ত অবকাঠামোর উন্নয়ন পণ্য ও মানুষের সহজ চলাচলের পূর্বশর্ত এবং আমরা গত এক বছরে বেনাপোল-পেট্রাপোল ও ডাউকিতে নতুন ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট (আইসিপি) এবং এবং শ্রীমন্তপুরে স্থল শুল্ক বন্দর উদ্বোধন হতে দেখেছি। বাংলাদেশী পণ্যের সহজতর প্রবেশাধিকার ত্বরান্বিত করতে আমরা বিএসটিআই-এর মানপরীক্ষা সার্টিফিকেট গ্রহণেও সহযোগিতা করছি।

'জ্বালানি: গত কয়েক বছরে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে সহযোগিতা ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে তার ভিশন 'সকলের জন্য বিদ্যুৎ' সহায়তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্তমানে, ভারত থেকে বাংলাদেশে ৬৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে এবং এতে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ যোগ করতে পারব বলে আশা করি। প্রকৃত পক্ষে, আমরা সরকারি ও বেসরকারি খাতে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রায় ৫০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা ভাবছি। এর মধ্যে দুটি প্রধান বেসরকারি বিনিয়োগ রয়েছে, আদানি পাওয়ার লিমিটেড এবং রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেড-এর সঙ্গে মোট ৩শো ২০কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে যা বাংলাদেশে অতিরিক্ত ২৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। (বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ৬৬০ মেগাওয়াট; পাইপলাইনে আছে ৫০০ মেগাওয়াট; রিলায়েন্স এবং আদানি দেবে ২৩৫০ মেগাওয়াট; রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আসবে ১৩২০ মেগাওয়াট)। আমরা যশোর-খুলনা অঞ্চলের চাহিদামূলক কেন্দ্রগুলোতে এলএনজি সরবরাহ; ভারত এবং বাংলাদেশের ঝিনাইদহ-খুলনা পাইপলাইনের মধ্যে গ্যাস গ্রিড আন্তঃসংযোগ স্থাপন; কুতুবদিয়ায় আইওসিএল-র একটি এলপিজি আমদানি টার্মিনাল স্থাপন এবং এলপিজি পাইপলাইন নির্মাণের কথা ভাবছি। এছাড়া, আমরা শিলিগুড়ি থেকে পার্বতীপুরে গ্যাসঅয়েল সরবরাহের জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি মৈত্রী পাইপলাইন স্থাপনের কথা ভাবছি যেটি ভারতীয় মঞ্জুরী সহায়তা থেকে নির্মাণ করা হবে।

'পরিশুদ্ধ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকল্পগুলো অন্বেষণ করা হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের সাথে পারমাণবিক জ্বালানি বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করতে পেরে আনন্দিত, বিশেষ করে যেহেতু রূপপুরে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মিত হচ্ছে এবং বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানি বিষয়ে তিনটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। আমরা ভুটানের সঙ্গে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতায় যৌথ বিনিয়োগের লক্ষ্যে আলোচনাও শুরু করেছি।

শ্রী শ্রিংলা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর ছিল উচ্চ-প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন তথ্যপ্রযুক্তি, মহাকাশ, বেসামরিক পারমাণবিক জ্বালানি, সাইবার নিরাপত্তা, ভূ-বিজ্ঞান ইত্যাদিতে সহযোগিতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণেরও একটি সুযোগ। এই মাসের শুরুতে আমরা দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করেছি যেটি বাংলাদেশসহ অংশগ্রহণকারী সকল দেশকে টেলিযোগাযোগ, টেলিমেডিসিন খাতে সেবা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উন্নত সহযোগিতাসহ বহুমাত্রিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করবে।

'নিরাপত্তা সহযোগিতা: ভারত ও বাংলাদেশের একটি চলমান ও শক্তিশালী

২০ মে, ২০১৭ দক্ষিণ কলকাতায় নজরুল মঞ্চে বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের দ্বতীয় সর্বোচ্চ পুরস্কার 'বঙ্গভূষণ' গ্রহণ করেন

নিরাপত্তা সহযোগিতা রয়েছে এবং দুটি দেশের সশস্ত্র বাহিনি এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপভোগ করে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই সফর ৫০ হাজার কোটি মার্কিন ডলারের প্রতিরক্ষা ঋণরেখার জন্য একটি সমঝোতা স্মারকসহ প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে এই সহযোগিতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার আওতায় বাংলাদেশ তার ইচ্ছামত যন্ত্রপাতি পছন্দ করতে পারবে। আমাদের কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনির মধ্যে সহযোগিতার একটি সফল দৃষ্টান্ত গত বছরে যৌথ অভিযানের সময় দেখা গিয়েছিল, যা ৬৩ জেলেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করেছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের সময় ভারত ও বাংলাদেশের কোস্টগার্ডদের মধ্যে পূর্বে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক কার্যকর করে তুলতে এপ্রিলে একটি এসওপি স্বাক্ষরিত হয়।'

হাই কমিশনার বলেন, 'জ্ঞান অর্থনীতিতে ভারত তার দক্ষতা ভাগাভাগি করেছে যেখানে আমরা তুলনামূলকভাবে ভাল করেছি। আমরা বাংলাদেশকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কিছু প্রস্তাব দিয়েছি যার মধ্যে রয়েছে ১৫০০-রও বেশি প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ১৫০০ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান। দক্ষতা উন্নয়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান, পশুচিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। আমাদের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং খুলনার নর্দান ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি; টাটা মেডিকেল সেন্টার এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনির চিকিৎসা সেবা অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আইআইটি ও আইআইএমসহ ভারতের প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশ থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের দ্বার উন্মুক্ত করেছে।

'আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের শক্তি ও আত্মা মানুষে-মানুষে শক্তিশালী যোগাযোগের মধ্যে নিহিত। একটি উদার ভিসা নীতি এবং বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য ভারতীয় ভিসা প্রাপ্তি সহজ করার লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারত ভ্রমণের হার বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে বর্তমানে ভারতে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পর্যটক হচ্ছেন বাংলাদেশী (২০১৬ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৬ লাখ)। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের ফলে চিকিৎসা ভিসা প্রদানের নিয়মাবলী আরও উদার করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশের জনগণ রোগ নির্ণয়ের জন্যও সহজে ভারত ভ্রমণ করতে পারেন।'

● নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

দক্ষিণ এশীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির ভিডিও কনফারেন্স

৫ মে, ২০১৭ ভারতের শ্রীহরিকোটা থেকে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (আইএসআরও)-র দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহের সাফল্যজনক উৎক্ষেপণ মহাকাশ ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতার এক অনন্য উদাহরণ।

উৎক্ষেপণকালে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের নেতৃবৃন্দ আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ ঘানি; বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; ভূটানের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় সেরিং টোবগে; মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আবদুল্লা ইয়ামিন; নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দহল 'প্রচণ্ড'; শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মইথ্রিপালা সিরিসেনা-র সঙ্গে এক নজিরবিহীন ভিডিও কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহ উৎক্ষেপণ ভারতের অঙ্গীকার পূরণের স্মারক এবং আমাদের অংশীদারিত্বের সবচেয়ে অগ্রসর সীমান্ত নির্মাণে যাত্রার শুরুও। তিনি বলেন যে, প্রকল্পটি টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার, টেলি-মেডিসিন, টেলি-এডুকেশন, ই-গভর্নেন্স, ব্যাংকিং/এটিএম সার্ভিস, সেলুলার ব্যাক-হ্যল, আবহাওয়া সংক্রান্ত উপাত্ত প্রদান, দুর্যোগ সতর্কতা এবং শিক্ষা ও গবেষণ প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্কিংয়ে মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভূটান, মালদ্বীপ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের জনগণের জীবন স্পর্শ করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, দক্ষিণ এশিয়া উপগ্রহ দেখিয়ে দিল যে আমাদের জনগণকে আমাদের সম্মিলিত পছন্দ বিরোধ নয় সহযোগিতা; ধ্বংস নয় উন্নয়ন; এবং দারিদ্র্য নয় সমৃদ্ধির জন্য একতাবদ্ধ করবে। প্রধানমন্ত্রী এই দৃষ্টিকল্প বাস্তবায়নে তাঁদের দৃঢ় ও মূল্যবান সমর্থন প্রদানের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশসমূহের নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপগ্রহের সফল নির্মাণ ও উৎক্ষেপণের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে অভিনন্দিত করেন এবং দক্ষিণ এশীয় জনগণের কাছে উপগ্রহ প্রযুক্তির সুফল পৌঁছে দেওয়ার ভারতীয় প্রচেষ্টার কথা বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন।

● বিজ্ঞপ্তি

১৭ মে ২০১৭ ঢাকায় অনুষ্ঠিত গঙ্গার জল বণ্টন সংক্রান্ত যৌথ কমিটির বৈঠকে কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

সত্যমেব জয়তে

শ্রী নরেন্দ্র মোদি
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বাণী

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সকল যোগনুশীলনকারীকে আমার শুভেচ্ছা। যোগ মন, দেহ ও বোধকে সমন্বিত করে। যোগ আজ মানবতাকেও সমন্বিত করছে।

এ দেশে আমরা যোগের অনন্য শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। যখন ধ্বংসাত্মক শক্তিসমূহ তাদের উপস্থিতি টের পাওয়াতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছিল এবং বিশ্বকে বিভক্ত করতে চাইছিল, তখন যোগই বিশ্বকে সন্নিবদ্ধ করেছে।

বিশ্বের প্রত্যেকটি মানুষ সুস্থ জীবনের প্রত্যাশী– দুশ্চিন্তা, রোগ ও অসুস্থতামুক্ত জীবন। সুস্বাস্থ্য শুধু অসুস্থতা থেকে আমাদের বাঁচায় না, আমাদের সার্বিক কুশলতাও প্রদান করে। যোগের মাধ্যমে কুশলতার পথে যাত্রা।

যোগ শুধু কতকগুলি শারীরিক কসরত নয়। বস্তুত শারীরিক সক্ষমতা হচ্ছে যোগের উপজাত। যোগ আমাদের শেখায় কিভাবে সুবিন্যস্তভাবে জীবন পরিচালনা করা যায়। এটি হচ্ছে স্থিতাবস্থ মন, সুস্থ শরীর, সৎচিন্তার চাবিকাঠি এবং আমাদেরকে আমাদের অন্তরাত্মার সঙ্গে সংযুক্ত করে।

আমাদের দৈনন্দিন রুটিন, দমবন্ধ সময়সূচি, বিভিন্ন কাজ ও দায়িত্বের মধ্যে চাপমুক্ত থাকা একান্ত আবশ্যক। আমাদের ইতিবাচক শক্তি চাই যা দুশ্চিন্তা দূর করে কর্তব্য পালনে আমাদের শক্তি যোগাবে এবং যোগ যথাযথভাবে এটাই করে।

কুশলতার পথে চলা এবং যোগানুশীলন আমাদের বাড়তি গতিবেগ যোগায়। আমি সকল যোগানুশীলনকারীর প্রতি আরো আরো মানুষকে যোগানুশীলনে আকৃষ্ট করে সারা বিশ্বে যোগী পরিবার বাড়ানোর আবেদন জানাচ্ছি।

আসুন আমরা যোগকে একটি আন্দোলনে পরিণত করি। তাহলে দেখবেন এটি বিশ্ব শান্তি, সম্প্রীতি ও সুখের ক্ষেত্রে কতখানি ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে।

স্বাস্থ্যপ্রদ আগামীর জন্য এই গণ-আন্দোলনে আমি আপনাদের সবাইকে যোগী হবার আমন্ত্রণ জানাই। আসুন সবাই মিলে আমাদের জনগণ ও সমাজের জীবনে গুণগত পরিবর্তন আনি।

নতুন দিল্লি
২৬ মে, ২০১৭

(নরেন্দ্র মোদি)

আয়ুশ মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭ উপলক্ষে প্রকাশিত
কমন ইয়োগা প্রোটকল-এ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির বাণী

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

প্রা র ম্ভ ক থা

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এই দিনটিকে বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে বেছে নিয়েছে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ। যোগ হলে প্রাচীন ভারতে উদ্ভূত এক বিশেষ ধরনের শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রথা। এর উদ্দেশ্য হল মানুষের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বিধান। এই প্রথা ভারতে আজও প্রচলিত। ২০১৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণদানকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব দেন। সে বছরেরই ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২১ জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বক্তৃতাদানকালে শ্রী মোদি বলেন, 'যোগ হচ্ছে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপহার। এটি দেহ ও মনে, চিন্তায় ও কর্মে, প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে; মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে মিলন ঘটায়; স্বাস্থ্য ও কুশলতার প্রতি মনে এক পবিত্র ভাব আনয়ন করে। এটা চর্চার নয়, বরং আপনার সঙ্গে একত্বের, বিশ্বের ও প্রকৃতির চেতনা আবিষ্কার করা। আমাদের জীবনধারার পরিবর্তন ও সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে এটি কল্যাণব্রতে সাহায্য করে। আসুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস প্রবর্তনে আমরা তৎপর হই।'

সেই প্রাথমিক প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০১৪ সালের ১৪ অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' শিরোনামে একটি অনানুষ্ঠানিক আলোচনার খসড়া প্রস্তুত করে। জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান জানান।

জাতিসংঘের ঘোষণা

২০১৪ সালের ১১ ডিসেম্বর জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি শ্রী অশোক মুখোপাধ্যায় সাধারণ পরিষদে ঐ খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। জাতিসংঘের ১৭৭টি সদস্য দেশের প্রতিনিধিরা ঐ খসড়া প্রস্তাবের প্রতি ঢালাও সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং এটি কোন ভোট ছাড়াই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নেতৃবৃন্দ এই উদ্যোগের প্রতি সমর্থন জানান। এ ধরনের উদ্যোগে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এত সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য এর আগে আর সমর্থন জানাননি।

২১ জুনকে তারিখ নির্ধারণের প্রস্তাব করে শ্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, 'উত্তর গোলার্ধে এই দিনটি দীর্ঘতম দিন (দক্ষিণ গোলার্ধে হ্রস্বতম), বিশ্বের বিভিন্ন অংশে এর বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যোগের প্রেক্ষাপটে গ্রীষ্ম অয়ন দক্ষিণায়নের সন্ধিক্ষণ। গ্রীষ্ম অয়নের পর প্রথম পূর্ণিমা গুরুপূর্ণিমা বলে পরিচিত। কথিত আছে, আদি যোগী শিব এই দিনে মানবজাতির উদ্দেশে যোগজ্ঞান বিতরণ করতে শুরু করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি আদি গুরু হয়ে ওঠেন। দক্ষিণায়ন এমন একটি সময় হিসেবেও বিবেচিত হয় যখন আধ্যাত্মিক অনুশীলনে রত ব্যক্তি প্রাকৃতিক অনুকূল্য লাভ করেন।'

জাতিসংঘ প্রস্তাব গ্রহণের ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গে জড়িত বহু গুরু এ উদ্যোগের জন্য ভারতকে সাধুবাদ জানান। ইশা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদ্‌গুরু এক বিবৃতিতে বলেন, 'মানুষের অভ্যন্তরীণ কল্যাণ কামনার বৈজ্ঞানিক মনোভাব গঠনে এটি এক ধরনের ভিত্তিপ্রস্তর, একটি বিশ্বব্যাপী জিনিস... এটি পৃথিবীর জন্য এক বিরাট পদক্ষেপ।' আর্ট অফ লিভিং-এর প্রতিষ্ঠাতা রবিশঙ্কর মোদির উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, ' রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোন দর্শন, ধর্ম বা সংস্কৃতির টিকে থাকা খুবই কঠিন। যোগ এতদিন পর্যন্ত এতিমের মত বেঁচে ছিল। এখন জাতিসংঘের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি সারাবিশ্বে যোগের উপকারিতা আরও প্রসারিত করবে।

ভারত সরকার ২০১৫ সালে পালিত প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের গতিবেগ আরো এগিয়ে নেবার সিদ্ধান্ত হিসেবে ২০১৬ সালে আরো অধিকসংখ্যক যুবককে যোগচর্চায় সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্যোগ নেয়। চণ্ডিগড়ে আয়ুশ মন্ত্রণালয় আয়োজিত 'জাতীয় গণ যোগ প্রদর্শন' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি অংশগ্রহণ করেন। ২০১৬ সালের ২০ ও ২১ জুন জাতিসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশন যোগবিষয়ক এক বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। 'যোগগুরুদের সঙ্গে আলোচনা– টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে যোগ' শীর্ষক ঐ আলোচনায় ইশা ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদ্‌গুরু ছিলেন প্রধান বক্তা।

এর আগে ২০১৫ সালের ২১ জুন প্রথম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে আয়ুশ মন্ত্রণালয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ৮৪টি দেশের বিশিষ্ট নাগরিকসহ ৩৫ হাজার ৯৮৫ জন বিভিন্ন বয়সের মানুষের অংশগ্রহণে নয়াদিল্লির রাজপথে এক বিরাট যোগানুষ্ঠানের আয়োজন করে, যেখানে ২১টি আসন অনুশীলন করা হয়। সারা বিশ্বের লাখ লাখ মানুষ এদিন যোগ দিবস পালন করে। বিভিন্ন স্থানে একযোগে 'সর্ববৃহৎ যোগানুশীলন'-এর আয়োজন করে কোন একক সংস্থা হিসেবে এনসিসি লিমকা বুক অফ রেকর্ডস্-এ জায়গা করে নেয়। আয়ুশ আয়োজিত রাজপথের ঐ অনুষ্ঠান দুটি গিনিস বিশ্ব রেকর্ড সৃষ্টি করে ও পুরস্কৃত হয়। আয়ুশমন্ত্রী শ্রীপদ যশ নায়েক এই সম্মানসূচক পুরস্কার গ্রহণ করেন।

নিবন্ধ

বাংলাদেশে যোগচর্চা ও এর প্রেক্ষিত

মোহাম্মদ হারুন

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে খুবই ক্ষুদ্র বা স্বল্প পরিসরে যোগের চর্চা ছিল। তবে যা ছিল তা সবই প্রায় একান্তই ঘরোয়া পরিবেশে এবং অনেকটা প্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আশির দশকে ড. মোহাম্মদ আশরাফ মিডিয়ার মাধ্যমে যোগকে তুলে ধরেন। এভাবে পরবর্তীকালে ভাস্কর রাশা, সেলিম কিছু কিছু কাজ করেন। যোগ সারা বিশ্বে একটি জনপ্রিয় স্বাস্থ্য ও আধ্যাত্মিক বিষয় হিসেবে পরিচিত ও সমাদৃত। মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই যোগের প্রচার ও প্রসারের লক্ষে আমিসহ আমার কয়েকজন সহকর্মী মিলে ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম 'বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন' গঠন করি যাতে যোগচর্চা ভবিষ্যতে একটি সাংগঠনিক ও প্রতিষ্ঠানিক রূপ পায়। আমি এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। ক্রমান্বয়ে আমাদের সংগঠন ২০০৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ফেডারেশনের সদস্যপদ লাভ করে।

২০১০ সালে এশিয়ান ইয়োগা ফেডারেশন গঠিত হলে আমাদের প্রতিষ্ঠান এর সদস্যপদ লাভ করে। এভাবে দীর্ঘ সময় চলতে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগবিষয়ক সেমিনার কর্মশালাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ চলতে থাকে। যোগচর্চার প্রচার ও প্রসারের জন্য ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা চ্যাম্পিয়নশিপ, ওয়ার্ল্ড ইয়োগা চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়ান ইয়োগা চ্যাম্পিয়নশিপ-এর অনুসরণে বাংলাদেশ প্রথম জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতা ২০১২, দ্বিতীয় জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতা ২০১৫, তৃতীয় জাতীয় যোগ প্রতিযোগিতা ২০১৬-র আয়োজন করা হয় আমাদের সংগঠনের ব্যানারে।

২০১৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২১শে জুন 'বিশ্ব যোগ দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। যোগের এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকা অপরিসীম।

এই ২১ শে জুন বিশ্ব যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সারা বিশ্বে যোগ দ্রুত প্রচার ও প্রসার লাভ করছে। যার প্রভাব বাংলাদেশেও লেগেছে। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশে যোগের প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্নভাবে কার্যক্রম করে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে 'ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' ও 'বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন'-এর মাধ্যমে অনেক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। বিশেষত ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন-এর কার্যক্রম অত্যন্ত ব্যাপক।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন তথা ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ এবং যোগ সারা বিশ্বে একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ 'বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন'কে ১৯ জুন ২০১৬ তারিখে স্বীকৃতি প্রদান করে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে– এজন্যে আমরা ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ও জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কাছে কৃতজ্ঞ।

আসন্ন ২১ শে জুন ঢাকার বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে পালিত হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চলছে ব্যাপক আয়োজন। ইতোপূর্বে ঢাকাসহ ঢাকার বাইরে যেমন: ২১ এপ্রিল ২০১৬ মৌলভীবাজার জেলা; ২৮ এপ্রিল ২০১৬ রাঙ্গামাটি জেলা; ১৯ মে ২০১৬ বান্দরবান জেলা; ২৬ মে ২০১৬ খুলনা জেলা; ০৬ জুলাই ২০১৬ গাইবান্ধা জেলায় যোগের ওপর বিভিন্ন কর্মশালা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

২১ জুন সারা বিশ্বে একসঙ্গে পালিত হচ্ছে তৃতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭। বিশ্বব্যাপী চর্চার মাধ্যমে যোগ সারা বিশ্বে আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে, যার প্রভাব আমাদের বাংলাদেশেও পড়বে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেন-না, ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের আয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ ও বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশে যোগচর্চা সফল ও সার্থক হোক।

মুহাম্মদ হারুন
প্রতিষ্ঠাতা ও যুগ্ম সম্পাদক
বাংলাদেশ ইয়োগা এসোসিয়েশন

নিবন্ধ

যোগ কী এবং কেন?

দীপেন সেনগুপ্ত

প্রথমে শরীর, তারপর মনের সম্মিলনে গড়ে ওঠে মানুষের সত্তা। এই পৃথিবীতে সর্বোত্তম প্রাণময় সত্তা হল মানুষ। নিজের জীবৎকালের সীমার মধ্যে মানুষ চায় নীরোগ দেহ ও প্রফুল্ল মন নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু একই সঙ্গে সুস্থ শরীর ও আনন্দে পরিপূর্ণ মনের সংযোগ এখন প্রায় দুর্লভ। নানাবিধ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও এই কাজে সাফল্য লাভ করতে পারেনি। অথচ প্রাচীন ভারতের মনীষীরা এমন একটি চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, যার সাহায্যে মানুষ সুস্থ জীবনযাপনে সক্ষম হবে শরীরে ও মনে। এই পদ্ধতিই আজ বিশ্বজুড়ে যোগ, যোগ্যব্যায়াম বা যোগচিকিৎসা নামে বিখ্যাত। বিভিন্ন চিকিৎসার জটিল প্রক্রিয়া ও প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে আজকের মানুষ যোগচিকিৎসা গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

যে রোগহীন জীবনের দিশা যোগচিকিৎসা দিয়েছে তার মূলে আছে যোগদর্শনে উল্লিখিত অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ 'আসন'। আসন অর্থাৎ আ-স-ন। 'আ' অক্ষরের অর্থ সর্বত্র। 'স' অর্থাৎ ঈশ্বর। আর 'ন'-র অর্থ জ্ঞান। সর্বত্র ঈশ্বরজ্ঞান অর্থাৎ সমস্ত প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা জয় করে উদার চেতনার পথে উত্তরণই যোগের লক্ষ্য। দেহতরঙ্গকে অবরোধক বিজ্ঞানের দ্বারা জয় করাই আসন সাধনার মূল ও একমাত্র পথ।

যে দেহটা আমাদের কাছে দৃশ্যমান তাকে স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষ বলে। আর মানসিক দেহকে তাঁরা চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে বলেছেন প্রাণময় কোষ, দ্বিতীয় ভাগকে বলেছেন মনোময় কোষ, তৃতীয় ভাগকে বলেছেন বিজ্ঞানময় কোষ, সর্বশেষকে বলেছেন আনন্দময় কোষ। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য খুব সামান্য। স্থূলদেহের দরকার হল 'প্রয়োজন' আর সূক্ষ্মদেহের দরকার হল 'চাহিদা'।

প্রতিটি আসন করার ক্ষেত্রে উৎসমূল, নামকরণ, আর্ষধারা, মানসিক যোগ্যতা, কী করে করতে হয়, বিকল্প আসন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, ভাবনা, অভ্যাস, সময়, উপকারিতা ও নিষেধ এই বারোটি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়ায় সঞ্চালন এবং সংস্থাপন করে অর্থাৎ আসনের সাহায্যে দেহের ও মনের রোগ, অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

ভারতীয় ঋষিদের মতে, একটা মানুষের দেহের মধ্যে পাঁচটা দেহ বর্তমান। যে দেহটা আমাদের কাছে দৃশ্যমান তাকে স্থূলদেহ বা অন্নময়কোষ বলে। আর মানসিক দেহকে তাঁরা চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগকে বলেছেন প্রাণময় কোষ, দ্বিতীয় ভাগকে বলেছেন মনোময় কোষ, তৃতীয় ভাগকে বলেছেন বিজ্ঞানময় কোষ, সর্বশেষকে বলেছেন আনন্দময় কোষ। স্থূলদেহ থেকে সূক্ষ্মদেহের পার্থক্য খুব সামান্য। স্থূলদেহের দরকার হল 'প্রয়োজন' আর সূক্ষ্মদেহের দরকার হল 'চাহিদা'। মানসিক দেহের চাহিদা যখন স্থূলদেহের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়, তখন স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। তৈরি হয় নানা আধি-ব্যাধি। আধি বলতে মানসিক রোগ বা বিক্ষেপকে বলা হয়। আর ব্যাধি বলতে ধরা হয় শারীরিক রোগ বিকারকে।

পৃথিবীতে প্রতিটি জীবজন্তু গাছপালা মানুষজন যে জীবিত আছে, তার জন্য মহাজাগতিক সূক্ষ্মরশ্মির তরঙ্গ মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে দেহ-মনকে জারিত করে হাত-পায়ের মধ্য দিয়ে বের হয়ে যায়। এটা সুস্থ ও স্বাভাবিক লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সেই তরঙ্গ অনেক সময় ছিন্ন হতে হতে চলে। এভাবে কিছুদিন চলতে চলতে তরঙ্গের একটা বিপরীত তরঙ্গ দেখা দেয়। অর্থাৎ আগে আকাশ থেকে দেহের মধ্যে দিয়ে মাটিতে তরঙ্গ আসছিল, এবার মাটি থেকে দেহের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ আকাশে যেতে আরম্ভ করল। এখান থেকে আধি-ব্যাধি শুরু হল। মাথা থেকে পায়ের দিকে মূল তরঙ্গস্রোত ফিরিয়ে দিতে ও বর্তমানে দেহে প্রবাহিত বিপরীত তরঙ্গকে নিম্নমুখী করতে প্রয়োজন কতগুলো বিশেষ ক্রিয়া। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা এই বিশেষ ক্রিয়াকে ৬৪ ভাগে ভাগ করেছেন– আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, শুদ্ধাহার, জীবনযাত্রার আচার-বিচার, খাদ্যতত্ত্ব, মালিশ, স্নানবিধি, ভেষজ, ধ্যান, ভগবত উপাসনা প্রভৃতি তার কয়েকটি। এই বিশেষ ক্রিয়া, ৬৪ ধারার মধ্যে দিয়ে সঠিক পথে জীবনকে চালিত করাকে বলা হয় যোগ। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতার জন্য শুধু আসনকে অনেকে যোগ বলে আখ্যায়িত করে থাকে।

অসুস্থ হলে শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। ওষুধ এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অসুবিধা হল যে, ওষুধ দেহে প্রবেশ করা মাত্র কাজ শুরু করে দেয়। ফলে রোগীর ঠিক কতটুকু প্রয়োজন তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। ওষুধের প্রয়োগ মানে দেহ ও মনের ওপর জোর দিয়ে কাজ করানো। যোগ ওষুধ ছাড়াই এই কাজ সুচারুভাবে করে।

মহর্ষি পতঞ্জলি পাতঞ্জল যোগদর্শনের অষ্টাঙ্গযোগে মানুষকে উত্তরণের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও সমাধির কথা বলেছেন। যম সাধনায় রয়েছে পাঁচটি অঙ্গ– অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এটা সম্পূর্ণ মানসিক চেতনা, একে দম অর্থাৎ অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ বলা যায় যার ভিত্তি হল আদর্শ। আবার অষ্টাঙ্গযোগের দ্বিতীয় অঙ্গ নিয়মে রয়েছে শৌচ (দৈহিক ও মানসিক শুদ্ধি), সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। এই নিয়মের অন্তর্গত হচ্ছে শম বা রহিরিন্দ্রিয় সংযম। অষ্টাঙ্গযোগের তৃতীয় অঙ্গ হল আসন। দেহতরঙ্গকে অবরোধক বিজ্ঞানের দ্বারা জয় করাই আসন সাধনার মূল ও একমাত্র পথ।

অসুস্থ হলে শরীরের স্বাভাবিক রাসায়নিক বিক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। ওষুধ এই রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন হতে সাহায্য করে। অসুবিধা হল যে, ওষুধ দেহে প্রবেশ করা মাত্র কাজ শুরু করে দেয়। ফলে রোগীর ঠিক কতটুকু প্রয়োজন তা পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। ওষুধের প্রয়োগ মানে দেহ ও মনের ওপর জোর দিয়ে কাজ করানো। যোগ ওষুধ ছাড়াই এই কাজ সুচারুভাবে করে।

দীপেন সেনগুপ্ত
পরিচালক, স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অফ কালচার যৌগিক কলেজ
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অফ কালচার

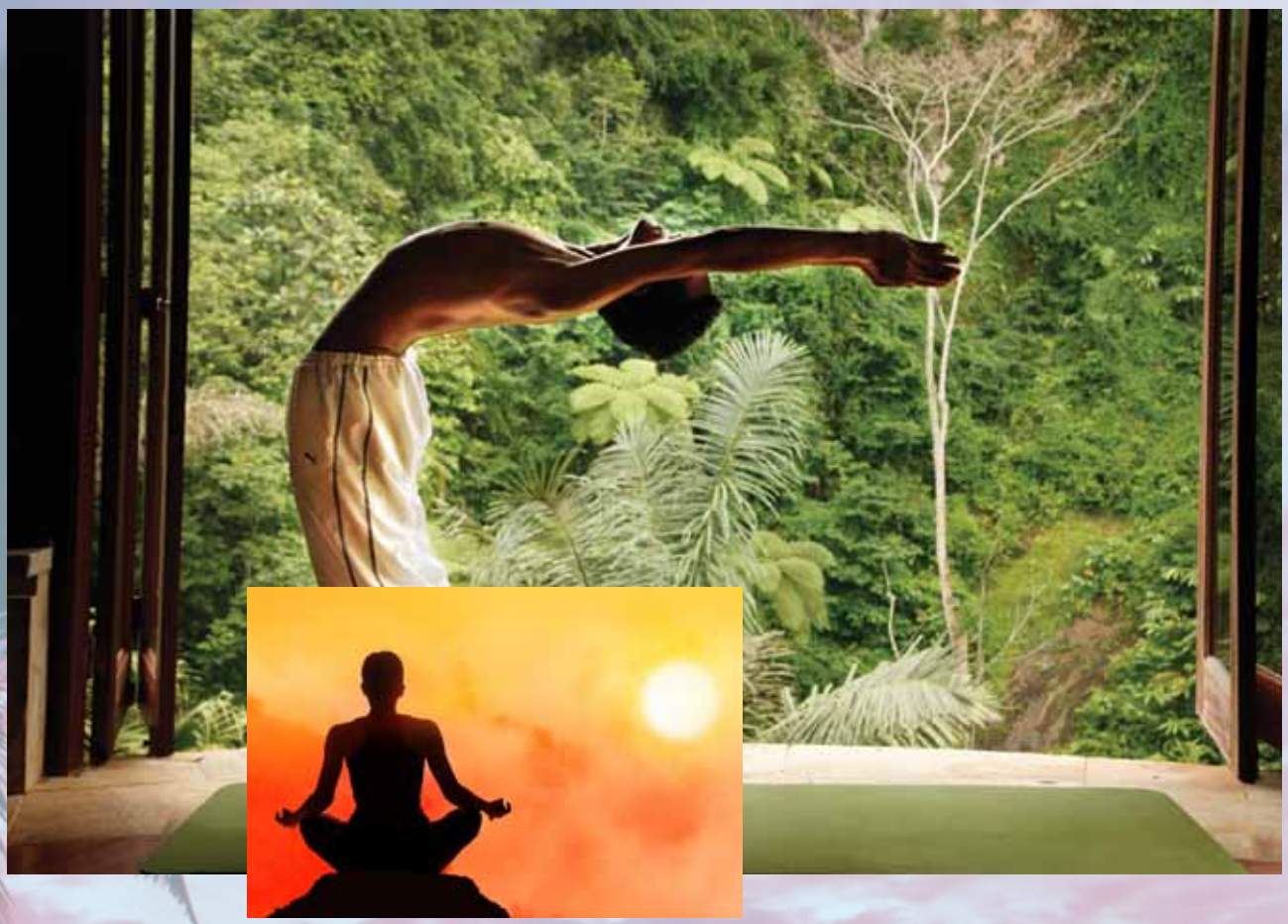

প্রবন্ধ

যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে

মথুরানাথ কুণ্ডু

যা আমাদের দেহ মন প্রাণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুস্থ রাখে, নীরোগ ও নিরাময় করে, যা আমাদের সকল কাজকর্মের মধ্যে শান্ত সুষম ছন্দ সঞ্চার করে, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের গ্লানি থেকে মুক্ত করে এবং সর্বোপরি যা আমাদের দেহে মনে আবদ্ধ আমিত্বকে দেহমনের সুদূর পারে অসীমের সঙ্গে যুক্ত করে, সেই যোগের সম্বন্ধে আমাদের না জানা বা বেঠিক জানার অন্ত নাই। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ কিছু ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ঘটিয়ে সত্যকে উপস্থাপন করবার সামান্য প্রয়াস। প্রচারমাধ্যমের কল্যাণে আজকাল কয়েকটি যোগাসন এবং প্রাণায়াম প্রায় সকলেই জেনে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাবেন যোগের আদ্য, মধ্য এবং অন্ত তাঁদের করতলগত। এমন কী তাঁদের যোগশিক্ষক হবার যোগ্যতাও যথেষ্ট। ব্যাপারটা ঠিক অতটা সহজ নয়। হাজার হাজার বছর আগে যখন প্রচলিত সুগঠিত ধর্মগুলির উদ্ভব ঘটেনি তখন কিছু মানুষের অদম্য স্পৃহা, জীবনজিজ্ঞাসা এবং নিরন্তর সাধনার ফলে আমাদের এই অবিভক্ত উপ-মহাদেশে যোগের অভ্যুদয় ঘটেছিল। তাঁদের শরীর এবং মন প্রাণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ বিজ্ঞানসম্মত সত্য আমাদের বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। বিজ্ঞানের বিশেষত পদার্থ-বিজ্ঞানের সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার আমাদের সেই বিস্ময় আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

মনে করা হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই যোগের প্রচলন ঘটেছিল। বৈদিক যুগে যোগের বহুল ব্যবহার হত এবং বুদ্ধদেবের সাধনা ও শিক্ষণ যোগের দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত। অতি প্রাচীনকালেই যোগ চিন, জাপান, তিব্বত এবং অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন রূপ পায়।

কালক্রমে মহতী যোগের বহমান ধারাটি লুপ্ত না হলেও ক্ষীণ হয়ে পড়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা এবং ইউরোপে বিশুদ্ধ যোগের বহুল প্রচার করেন। পরবর্তীকালে পরমহংস যোগানন্দ তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্থাপনা সেল্‌ফ রিয়েলাইজেশন ফেলোশিপের মাধ্যমে লস এঞ্জেলেস থেকে যোগের একটি সুন্দর শিক্ষাক্রম তৈরি করে দূরশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় যোগের প্রচার করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যোগ-সমন্বয় (ঝুহঃযবংরং ড়ভ ণড়মধ) মহাগ্রন্থে যোগের নানাদিক নিয়ে বিস্ময়করভাবে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক উক্ত গ্রন্থটি পড়ে দেখতে পারেন। সাম্প্রতিককালে আমেরিকা এবং ইউরোপে রাজযোগের রহস্যজনক শিক্ষাসমূহ নামে-বেনামে বহুল প্রচার পেয়েছে। তবে সব দেশেই হঠযোগের আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম বিকল্প নিরাময়পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে।

বিশুদ্ধ যোগের আদিগ্রন্থ প্রামাণিক তত্ত্ব পাওয়া যায় মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে। যোগের ব্যবহারিক দিক নিয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা রয়েছে গীতায় এবং আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম সম্বন্ধে প্রক্রিয়ামূলক এবং সামগ্রিক তথ্য পাওয়া যায় হঠযোগ প্রদীপিকা গ্রন্থে। আমি পাঠকদের উক্ত গ্রন্থগুলি অনুবাদে হলেও পড়ে দেখতে বলব।

প্রথমেই মনে রাখতে হবে যোগ কোন ধর্মীয় বিষয় নয় এবং এটি কোনভাবেই হিন্দু ধর্মের সোপান নয়। এটি সম্পূর্ণভাবে মানবিক, প্রক্রিয়ামূলক এবং বিজ্ঞানসম্মত। যোগের সঙ্গে কোন ধর্মেরই কোন বিরোধ নেই। বরং এটি বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসীদের নানাভাবে সাহায্য করতে পারে। যোগে কোন মতামত চাপিয়ে দেওয়া হয় না এবং একটি বন্ধনহীন উন্মুক্ত মন তথা মনশূন্যতায় অবস্থানের প্রচেষ্টা করা হয়।

দেহ, মন এবং প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য এনে আমাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই যোগের লক্ষ্য। এখানে পুঁথিগত জানার প্রতি জোর না দিয়ে 'হয়ে ওঠা'র দিকে জোর দেওয়া হয়। যোগের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনা থেকে গড়ে ওঠে, চাপিয়ে দেওয়া হয় না। আমরা মানুষ হিসেবে যে যেখানে আছি সেখান থেকেই সরাসরি যোগ শুরু করতে পারি।

একবার একটা চোর এক মহাযোগীর কাছে গিয়ে বলে, 'মহাশয়, আমি একজন চোর। চুরি করেই জীবিকা নির্বাহ করি। আমার মত লোকের পক্ষে কি যোগশিক্ষা সম্ভব?' সেই যোগী চোরের সত্য কথায় বিস্মিত হয়ে সংক্ষেপে বললেন, 'অবশ্যই পার। সকলেই যোগশিক্ষার অধিকারী।' এবার চোরের অবাক হবার পালা। সে বলল, 'কিন্তু ইতোপূর্বে আমাকে অনেকে বলেছেন যে আগে চুরি করা বন্ধ না করলে যোগ শেখা যাবে না–' এবারে যোগী একটু হেসে বললেন, 'তোমার মধ্যে জ্ঞানের আলো নেই তাই অজ্ঞানের অন্ধকারে তুমি চুরি করতে পারছ। অন্ধকারের সাথে সরাসরি লড়াই করা যায় না। যোগের আলো তোমার মধ্যে প্রবেশ করতে দাও তাহলে আর কোন অন্ধকার থাকবে না। সেই দিব্য আলোতে চুরি কেন, কোন অন্যায় কাজই করতে পারবে না। তোমার অন্তরের আলোই তোমাকে সঠিক পথ দেখাবে।'

সূর্যের কিরণ যেমন স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করে সর্বত্র সমানভাবে আলোকিত করে তেমনি যোগের আলো আমাদের অন্তর এবং বাহিরকে যুগপৎ উদ্ভাসিত করে তোলে। একটি গাড়ি ঠিকমত চালানোর জন্য যেমন উপযুক্ত একটি পরিবহন যন্ত্র, জ্বালানি বা শক্তির যোগান এবং দক্ষ চালকের প্রয়োজন তেমনি আমাদের পার্থিব জীবনপ্রবাহেও একটি নীরোগ শরীর, অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য এবং পরিশীলিত মনের একান্ত প্রয়োজন। যোগ এই দেহ, প্রাণ এবং মনের ভারসাম্য বজায় রেখে আমাদের সুস্থ এবং সৃষ্টিশীল রাখে। আমাদের সবরকম রোগের মূল কারণ প্রতিরোধ ক্ষমতার স্বল্পতা এবং স্ট্রেস। যোগ আমাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা পর্যাপ্ত করে এবং সর্বতোভাবে স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

আমাদের দেহমনের সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ মূলত প্রাণের পাঁচরকম কাজের উপর নির্ভরশীল এবং এগুলি আমাদের জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আপনা-আপনি হতে থাকে। শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, হজমক্রিয়া, সংগ্রহণ এবং রেচনক্রিয়া বিভিন্ন বায়ুর সাহায্যে ঘটে থাকে এবং এদের

কোন একটির সামান্য বৈকল্যে শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এবিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নয় কিন্তু যোগীরা প্রাচীন কাল থেকেই এগুলি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা রোগ নিরাময় করতে জানতেন।

সমস্ত দিন সব সময় আমাদের মনে নানারকম চিন্তার উদয় হতে থাকে যার সম্বন্ধে আমরা সচেতনভাবে অবহিত থাকি না। এই সব বাজে লাগামহীন চিন্তা-স্রোতের ফলে আমাদের মানসিক শক্তির অপচয় হয়, একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। যোগ আমাদের সবসময় মনোযোগী থাকতে শেখায় এবং বাজে চিন্তা নিয়ন্ত্রণে এনে একাগ্রতা বাড়ায়। একাগ্র মনই সমস্ত ক্ষমতা ও সৃষ্টিশীলতার উৎস। আজকাল আমরা মানবসম্পদ উন্নতির কথা বলে থাকি। যোগের মাধ্যমে শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির দ্বারা মানবসম্পদের যথাযথ প্রয়োগ এবং প্রসারণ ঘটে যা ব্যক্তি, জাতি এবং দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর।

যোগ মানুষের চেতনার সীমাহীন প্রসার ঘটায় যার ফলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নৈতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয়। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ আমরা সহজেই স্ট্রেস নিয়ন্ত্রণ করে, সবসময়ে মানসিক ভারসাম্য বজায় রেখে বেঁচে থাকার নতুন মাত্রা খুঁজে পাই। জীবনের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। জীবন প্রকৃত আনন্দময় হয়ে ওঠে।

সাধারণত আমরা উৎকট অহংবোধের শিকার হয়ে আমাদের কর্মজীবন এবং নশ্বর পার্থিব সঞ্চয়সমূহকেই জীবন বলে ভেবে বসি। কর্মজীবন এবং বিষয়-সম্পত্তি জীবনের ক্রমবর্ধমান পরিধিমাত্র। এর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে আমাদের আসল অবস্থান বা সত্তা, যা সদা অঞ্চল, অবিকৃত এবং অপরিণামশীল। জীবনবৃত্তের পরিধি এই সদাস্থির কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই কেন্দ্র সম্পূর্ণভাবে পরিধিনিরপেক্ষ থাকতে পারে। যোগ আমাদের জীবনকে স্থির কেন্দ্রাভিমুখী করে তোলে যার ফলে আমরা সঠিক পথ এবং কর্মনির্দেশ অন্তর থেকেই পেয়ে থাকি এবং জীবনের পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হই।

যোগের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যর কথা অনেকটা বলা হল। এবার দেখা যাক যোগ মানে কী। যোগ শব্দটি সংস্কৃত 'যুজ্' ধাতু থেকে উদ্ভুত যার মানে যুক্ত করা। যোগ আমাদের শরীর মন প্রাণকে অন্তহীন উৎসের সঙ্গে যুক্ত করে যার উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন, 'আমারে তুমি অশেষ করেছ।'

এ ছাড়া যোগ আমাদের সব রকম অবস্থায় সমতা রক্ষা করায়– ভাল-মন্দ, লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় সমানভাবে গ্রহণ করতে শেখায়। তাই গীতায় বলা হয়েছে, 'সমত্বং যোগ উচ্যতে,' যেহেতু যোগের মাধ্যমে সমস্ত কাজে কুশলতা আসে তাই গীতায় আরও বলা হয়েছে, 'যোগ কর্মসু কৌশলম।' তবে যোগের সবচেয়ে বড় সংজ্ঞা পাওয়া যায় মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে– 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।' আমাদের চিত্ত সবসময়ে প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্যয়, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটি বৃত্তির মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এই বৃত্তিগুলির সমূহ নিরোধ হলে আমরা মনশূন্যতায় অবস্থান করি। সেটাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ– 'তদা দ্রষ্টুঃস্বরূপে অবস্থানম।' সুতরাং সেই চরম মনশূন্যতায় উত্তরণ করাই যোগের পরম লক্ষ্য। তখন আমরা দেহমনের সুদূর পারে নিজেকে হারিয়ে সমগ্র বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্ম বোধ করি।

স্বাভাবিকভাবেই যোগ নানা প্রকারের এবং অধিকারী ভেদে আমাদের যোগের পথও আলাদা হতে পারে। যেহেতু আমাদের সকলেরই একটি স্বাস্থ্যবান, নীরোগ শরীরের প্রয়োজন তাই প্রারম্ভিক যোগ হল হঠযোগ। এটি আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও বন্ধের অভ্যাসের ফলে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং নানারকম দুরারোগ্য রোগও নিরাময় করে। রোগপ্রতিরোধ, নিরাময় এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখাই হঠযোগের লক্ষ্য, তাই এটিকে রাজযোগের ঐচ্ছিক সোপান বলে গণ্য করা হয়। অবশ্য হঠযোগ ছাড়াও রাজযোগের সার্থক অভ্যাস করা যায়। রাজযোগ মূলত মানসিক এবং অন্তঃপ্রকৃতির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনে। যেহেতু এটি অতিদ্রুত ফলদায়ী এবং প্রত্যক্ষ পথ, তাই এটিকে রাজযোগের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটি অষ্টাঙ্গযোগের পথ যথা– যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

এছাড়া আমরা নিয়ত আত্মানুসন্ধানের মধ্য দিয়েও যোগের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি। এটি বিচারধর্মী এবং জ্ঞানযোগের পথ। যাঁরা স্বভাবতই ভক্তিপ্রবণ, ধার্মিক এবং ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁদের জন্যে সহজপথ ভক্তিযোগের মাধ্যমে ঈশ্বরে সমস্ত কিছু মানসিকভাবে সমর্পণ করা। তখন আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ভালমন্দ এবং কামনা-বাসনার নিরসন ঘটে। কবি গেয়েছেন, 'তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।' জীবন তখন পাল তোলা নৌকার মত অনায়াসে ঈশ্বরনির্ভর হয়ে এগিয়ে চলে।

যদি আমরা ব্যক্তিগত লাভালাভের হিসাব না করে সুষ্ঠুভাবে নিজের কাজ করে যাই এবং নিজেকে মানবকল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত রাখি তাহলে সেটি হবে কর্মযোগের পথ যা সবসময়ে কঠিন। তবে প্রকৃতি এবং রুচিভেদে আমরা যে যোগপথই অবলম্বন করি না কেন উপরিউক্ত পথগুলি একে-অন্যের পরিপূরক এবং এদের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই এবং একটি যোগের নিষ্ঠাসম্পন্ন অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যোগের অন্য পথগুলিরও সমন্বয় ঘটে থাকে।

যোগের সবচেয়ে বড় ফল হল সর্ববিধ দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, আমাদের সমুদয় দুঃখের কারণ পাঁচটি– অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। প্রকৃত জ্ঞানের অভাব, অহংবোধে আবদ্ধ থাকা, নানা বিষয়ে আসক্তি বা বিদ্বেষ এবং মৃত্যুভয় আমাদের দুঃখ দেয়। এগুলি জয় করতে না পারলে প্রকৃত আনন্দ বা শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এগুলি সম্যকভাবে দূর করার সার্থক উপায় হচ্ছে যোগ।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যোগের দ্বারা আমাদের দেহমন সুস্থ ও নীরোগ থাকে, মানসিক ক্ষমতার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হয়, জীবন একটি সুষম ছন্দে ও আনন্দে ভরপুর হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে এগোতে থাকে। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাই– 'যুক্ত কর হে যোগের সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ, সঞ্চার কর সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।'

মথুরানাথ কুণ্ডু
ভারতের প্রাবন্ধিক, যোগচর্চাকারী

নিবন্ধ

গর্ভাবস্থায় যোগ

তৃপ্তি মেহতা দেশপাণ্ডে

‘আপনি গর্ভবতী অথচ যোগানুশীলন করছেন?’ ‘গর্ভাবস্থায় আপনি কিভাবে যোগানুশীলন করতে পারেন?’, ‘যোগানুশীলন বন্ধ করুন, আপনি এখন গর্ভবতী’, ‘যোগানুশীলনের সময় সতর্ক থাকুন’ ইত্যাদি ইত্যাদি, আমি গর্ভবতী জানার পর প্রতিক্রিয়া ও প্রশ্নমালা ছিল আমার পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের।

আপনি যখন যোগ শব্দটি শোনেন, অধিকাংশ মানুষ মনে করে এটা হচ্ছে কিছু আসন করা, মাথা বাঁকিয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু শরীরকে কষ্ট দেওয়া। জানা উচিত, যোগ হচ্ছে অষ্টাঙ্গপথ জীবনশৈলী, শুধু আসন নয়।

যোগ সম্পর্কে ভুল ধারণার কারণে অনেকে মনে করেন, গর্ভকালীন সময়ে যোগানুশীলন থেকে বিরত থাকা উচিত। এটা ঠিক যে, গর্ভকালীন বিহ্বল সময়ে প্রত্যেকটি মায়েরই সতর্ক থাকা উচিত। তবে গর্ভাবস্থাকে অসুখ ভাববেন না দয়া করে, এসময় আপনি যথাযথ খাবার খাবেন, বিশ্রাম নেবেন। তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গর্ভাবস্থার আগে ও পরে এবং গর্ভাবস্থায় যোগনুশীলন আপনার মাতৃত্বের যাত্রায় (অর্থাৎ গর্ভাবস্থায়, জন্মদান, নবজাতক ও আপনার নিজের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে) প্রভূত মানসিক ও শারীরিক শক্তি যোগায়। শুধু তাই নয়, যোগ আপনার শরীরকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

গর্ভাবস্থায় সন্তান জন্মের আগে যোগ কেন মঙ্গলজনক? গর্ভাবস্থায় শরীরে প্রভূত পরিবর্তন আসে। গর্ভাশয়ের মধ্যে যখন নতুন একটি শরীর বাড়তে থাকে, তখন প্রচুর শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োজন হয় ভারবহনক্ষম হবার জন্যে। গর্ভাশয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে চাপ বাড়তে থাকে। এর ফলে শরীরের সাম্যাবস্থার পরিবর্তন ঘটে যা পৃষ্ঠদেশের নীচের দিককার

পেশিকে অতিরিক্ত কাজ করতে ও চাপ নিতে বাধা দেয়। শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হরমোনের পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যোগাসন পা, কোমর, পৃষ্ঠদেশ, শ্রোণিদেশ, বাহু ও কাঁধ শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। যোগ শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, শরীরের গ্রন্থি ও পেশির ঘূর্ণন বৃদ্ধির ফলে স্ফীতি কমে, শক্তি বাড়ে।

গর্ভকালীন হরমোন শুধু শরীর নয়, মন ও ভাবাবেগেও পরিবর্তন আনে। প্রাণায়াম ভাবাবেগের উত্থান-পতনে সাহায্য করে এবং সার্বিক শক্তি ও মনে প্রয়োজনীয় শিথিলতা আনে। গর্ভকালীন সময়ে যথাযথ শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ, গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ পদ্ধতি চাপ ও দুশ্চিন্তা হ্রাসে সাহায্য করে। শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের বিন্যাসে মনোনিবেশ করার মাধ্যমে, শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের নির্দেশনায় পরিবর্তন এনে যে কেউ তার শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। আর শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে সচেতনতা থেকে আত্মসচেতনতার সূচনা। আত্মসচেতনতা সাহায্য করে আপনার শরীরে-মনে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, সে সম্পর্কে সজাগ হতে। যোগানুশীলন যেহেতু শরীর-মন সম্পর্কে অবগত হতে সাহায্য করে, কাজেই যোগ শরীরের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে।

গর্ভাবস্থায় যোগানুশীলনে কতিপয় বিবেচ্য বিষয়:

- প্রশিক্ষিত নির্দেশকের যথাযথ তত্ত্বাবধানে যোগানুশীলন করতে হবে।
- আপনার গাইনোকোলজিস্টের সঙ্গে আলাপ করে আপনার যোগানুশীলন, আসন সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করুন।
- আপনি যদি কখনও যোগানুশীলন না করে থাকেন, ধীরে ধীরে অগ্রসর হন। শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ কৌশল দিয়ে প্রথমে শুরু করুন। কখন, কিভাবে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করতে হবে জানুন। জানুন কিভাবে গভীর শ্বাস নেবেন এবং শরীরকে শিথিল করে দেবেন।
- গর্ভাবস্থায় ১০ থেকে ১৪ সপ্তাহের মধ্যে আসন অনুশীলন না করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। কারণ এ সময়টা শিশুর বৃদ্ধির জন্যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।
- ওয়ার্ম-আপ দিয়ে শুরু করুন। হাত-পা ছোড়া শরীরের ওয়ার্ম আপ করার এক চমৎকার পন্থা।
- প্রচুর জল পান করুন। শরীর জলযুক্ত রাখুন। তবে খেয়াল রাখবেন যোগানুশীলনের সময় যেন জলথলিতে কোন জল না থাকে।

- গর্ভকালীন সময়ের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথম তিন মাসে বমি হতে পারে, চাল-চলনে কিছু পরিবর্তন আসতে পারে। যোগানুশীলনের প্রথমাবস্থায় বীরভদ্রাসন, বৃক্ষাসনের মত দাঁড়ানো আসনের চর্চা করা যেতে পারে। এর ফলে দুই পা ও গ্রন্থি মজবুত হবে এবং ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হবে।
- গর্ভকালীন সময়ে বিড়াল, প্রজাপতি, উবু হয়ে বসা এবং উজ্জয়ীর মত শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন করা যেতে পারে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় তিন মাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও ধ্যান করা যেতে পারে। বিপরীত কার্নি-র মত বিপরীত আসন, তলপেটে চাপ পড়ে এমন আসন, কিংবা গভীরভাবে সামনে এগিয়ে আসা কিংবা পেছনের দিকে বেঁকে যাওয়ার মত আসন এড়িয়ে চলুন। চিৎ হয়ে শোয়া থেকে বিরত থাকুন যাতে জরায়ুতে রক্ত চলাচল সহজ হয়। যোগানুশীলনের সময় কখনও শ্বাস ধরে রাখবেন না। শ্বাস বন্ধ রাখা– প্রাণায়াম ধরনের চর্চা থেকে বিরত থাকবেন।
- আত্মস্থ হওয়ার জন্য প্রাণায়াম, শরীর শিথিল করে দেওয়া, ধ্যান বা মন্ত্রোচ্চারণ বন্ধ করা।
- উষ্ণ কক্ষে যোগানুশীলনের চেষ্টা না করা।
- সবসময় আপনার শরীরকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনার সাধারণ জ্ঞান ব্যবহার করুন এবং আপনার স্বাভাবিক ছন্দে চলুন।

সুস্থ গর্ভাবস্থার জন্য যম, নিয়ম:

- হাঁটা ও সাঁতার কাটা হচ্ছে সর্বোত্তম ব্যায়াম যা যোগের সঙ্গে যুক্ত।
- আপনাকে যদি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার শেষ দিকে, পায়ের ওপর চাপ পড়তে পারে। আরাম পেতে পায়ের পাতা উঁচু করুন। আপনার যদি বসার চাকরি হয়, পায়ের পাতা উঁচু রাখতে একটি ছোট টুল স্থাপন করুন।
- আপনি কেমন অনুভব করেন, সেখানে খাবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্যে বিষক্রিয়া রোধে এবং মানসম্পন্ন খাবার নিশ্চিত করতে ঘরে তৈরি টাটকা খাবার খান।
- ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ক্যালসিয়াম, আয়রনের মত সম্পূরক খাদ্য গ্রহণ করুন। এছাড়াও সুষম খাবার (সঠিক পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, আঁশযুক্ত খাবার, ভিটামিন, মিনারেল প্রভৃতি) গ্রহণ খুবই জরুরি। অত্যাবশ্যকীয় ভিটামিন ও মিনারেলের জন্য গর্ভবতী নারীকে প্রতিদিন ২/৩ ধরনের ফল ও সবজি খেতে হবে। এর ফলে গর্ভাবস্থার সাধারণ সমস্যা কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্ত থাকা যাবে।
- গর্ভাবস্থা মানে আপনাকে চিনি, ময়দা, চর্বিযুক্ত প্রচুর পরিমাণ মিষ্টিজাতীয় খাদ্য খেতে হবে, এটা ভুল ধারণা। গর্ভাবস্থায় আপনাকে দিনে দু'বার খেতে হবে, এটাও আরেকটা ভুল ধারণা। প্রকৃতপক্ষে, গর্ভবতী নারীকে তার ক্ষুধার চেয়ে একটু বেশিই খাওয়া উচিত। পরিমাণ নয়, খাদ্যের মানই গর্ভাবস্থায় বেশি দরকার। সুতরাং আপনার শরীরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং বুঝেশুনে খান।
- গর্ভাবস্থা যত এগিয়ে আসতে থাকে, বিরতি দিয়ে দিয়ে অল্প অল্প করে খাওয়া উচিত। এর ফলে হজম সহজ হবে, গ্যাস হবে না।
- মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন, এত এসিডিটি হবে। গর্ভকালীন সময়ে বুক জ্বালা করা একটি সাধারণ অভিযোগ।
- ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত দু'ঘণ্টা আগে রাতের খাওয়া সেরে নিন।

আমি মনে করি, গর্ভাবস্থা নারী ও পুরুষের উভয়েরই পরস্পরকে বোঝার, ব্যায়াম ও পুষ্টিবিজ্ঞানসংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ঝালিয়ে নেওয়ার, জীবনশৈলী, খাদ্যাভ্যাসসংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপনের একটা সুযোগ। এটা আপনাকে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যপ্রদ জীবন নির্মাণে প্রভূত সাহায্য করবে।

'সমত্বং যোগ উচ্যতে', যোগের সমার্থক শব্দবন্ধ। ভাগবৎ গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এভাবেই যোগের বর্ণনা দিয়েছিলেন। এটা হচ্ছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে শরীর ও মনের ভারসাম্য বজায় রাখা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, গর্ভাবস্থা এমন একটি দশা যেখানে মননের, কর্মের সাম্যাবস্থা খুবই প্রয়োজনীয়। এর ফলে একটি আনন্দপূর্ণ গর্ভাবস্থা হতে পারে যার ফলে আপনি একটি সুন্দর, সুস্থ, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শিশুর জন্ম দিতে পারেন। এটাই হবে মানবসভ্যতা ও সমাজের প্রতি আপনার মহত্তম অবদান।

তৃপ্তি মেহতা দেশপাণ্ডে
ভারতের প্রশিক্ষক ও অনুশীলক
স্বামী বিবেকানন্দ যোগ অনুসন্ধান সংস্থান

নিবন্ধ

আসুন যোগানুশীলন করি

বিরদ রাজারাম যাজ্ঞিক

পৃথিবীর সর্বত্র আজ যোগ অনুশীলিত হয়ে থাকে। ভারতীয় পুরাণ ও প্রাচীন পুঁথিপত্রে যোগের মূল নিহিত হলেও আজ আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি জাতি ও সমাজের জীবনে যোগ ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় এখন যোগ-সাহিত্য পাওয়া যায় এবং এটি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য ও কুশল-শিল্পের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। আমার যোগ-যাত্রা শুরু হয়েছিল ব্যাংককের হেরিটেজ হোটেল নেই লের্ত পার্ক-এ, এর প্রতিষ্ঠাতা নেই লের্ত-এর পরিবেশ, প্রকৃতি ও এর সংরক্ষণ সংক্রান্ত দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়ে। হোটেলের ব্যবস্থাপনা পরিচালিকা নাফা পোর্ন বদিরত্নংকুরা (লেক) লের্ত-এর প্রোপৌত্রী। নাফা পোর্ন ব্যাংককের যোগ অনুশীলন কেন্দ্রগুলির সমন্বয়ক এবং একজন শুদ্ধ যোগ অনুশীলনকারিণী। প্রাগ্রসর যোগাসন অনুশীলনরত লেক-এর বিভিন্ন আলোকচিত্র দেখে আমি অনুধাবন করলাম যে, শিগগিরই বিশ্বে আধুনিক যোগ প্রবর্তিত হতে যাচ্ছে।

তাঁর ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর গোপন কথা হচ্ছে সুখাদ্য, সুনিদ্রা আর দৈনিক যোগানুশীলন। শুনলে বিস্মিত হতে হয়, বর্তমান যোগ ব্যবসায়ে বিশ্বব্যাপী ২ হাজার ৭শো কোটি ডলার লগ্নি হয়েছে। এই অর্থ যোগের অনুশীলন, প্রকাশনা ও যোগ-সংক্রান্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত হচ্ছে। অনুশীলন হচ্ছে যোগের মূল শক্তি, প্রকাশনা হচ্ছে জ্ঞানশক্তি আর পণ্য হচ্ছে ব্যবসায় শক্তি। এই তিন শক্তিই পরপর নির্ভরশীল এবং একটি শক্তিশালী যোগের পরিবেশ সৃষ্টিতে এই তিনের সমন্বয় অপরিহার্য।

উপরোক্ত তিন শক্তির প্রথমটি হচ্ছে বিক্রম যোগ। বিক্রম যোগ অনুশীলনের জন্য সারা বিশ্বে পাঁচ হাজারের অধিক যোগানুশীলন কেন্দ্র রয়েছে; ১৯৭৫ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ইয়োগা জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর পাঠক সংখ্যা ১৩ লাখ; যোগের পোশাক-সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী চেইন শপ লুলু লেমন। যোগ পণ্যখাতে ব্যয় হচ্ছে ১শো ৩০ কোটি ডলার।

একটি শক্তিশালী যোগ ব্র্যান্ড তৈরি করতে আপনার প্রয়োজন হবে সঠিক পরিবেশ, যা কিনা যোগের ব্যবসায় সুরক্ষা করবে। যোগের মূল উৎপত্তি হাজার হাজার বছর আগে হলেও আধুনিককালের ব্র্যান্ড যোগের জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সুরক্ষা একান্ত অত্যাবশ্যক।

যোগ আজ বিশ্বব্যাপী যে পদচিহ্ন রাখতে পারছে, তার অন্যতম কারণ হচ্ছে সময়, অঞ্চল ও সমাজের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তনের ক্ষমতা। যোগ খুবই নমনীয়– শুধু আসনের ক্ষেত্রে নয়, পরিবেশের ক্ষেত্রেও। আজকের দিনের ব্যবসায়িক পরিবেশের জন্য চাই উদ্ভাবন, গবেষণা এবং যোগ-পণ্য উৎপাদনে প্রণোদনা যা হবে কপি রাইট আইনের মাধ্যমে সুরক্ষিত। শুধুমাত্র তখনই ব্যবসায়ের আইন ব্র্যান্ড যোগের জন্যে সুফল বয়ে আনতে পারবে।

ব্র্যান্ড যোগ হচ্ছে একটি উপহার– বিশ্ব যা পর্যবেক্ষণ করেছে। কুশলতা ও স্বাস্থ্য শিল্পের নেতৃত্বদানে এর শক্তিমত্তা অপরিসীম। বিশ্বকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে হাজার হাজার লোক এ কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। তবে আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখা থেকে বিরত থাকুন, যোগ কেবলই অনুশীলনের বিষয়, অতীতে যেমন ছিল। যে কোন ধরনের পরিবর্তন একে লঘু করে ফেলবে। যোগ আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং এই আবিষ্কারের ফলে এটি ব্যাপক গণভিত্তি পেয়েছে। যে কোন ধরনের গোঁড়ামি এর প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আসুন আমরা সবাই একবিংশ শতাব্দীর ব্যান্ড যোগ সৃষ্টিতে বর্তমান ব্র্যান্ড ও ব্যবসায়িক পরিবেশকে স্বাগত জানাই।

বিরদ রাজারাম যাজ্ঞিক ভারতের তাত্ত্বিক, যোগসাধক

ঘটনাপঞ্জি ❖ জুন

০১ জুন ১৮১৪ ❖ কলকাতায় ভারতীয় সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠা
০৩ জুন ১৯৪৩ ❖ দক্ষিণ ভারতের সুরকার ইলাইয়ারাজার জন্ম
০৫ জুন ১৯৬১ ❖ টেনিস তারকা রমেশ কৃষ্ণণের জন্ম
১১ জুন ১৯০১ ❖ প্রমথনাথ বিশীর জন্ম
১৬ জুন ১৯২৫ ❖ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৪ ❖ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মৃত্যু
১৬ জুন ১৯৪৭ ❖ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর জন্ম
২০ জুন ১৯২৩ ❖ গৌরকিশোর ঘোষের জন্ম
২১ জুন ২০১৫ ❖ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের সূচনা
২৫ জুন ১৯২২ ❖ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তর মৃত্যু
২৫ জুন ১৯৪১ ❖ গুরুসদয় দত্তর মৃত্যু
২৬ জুন ১৮৩৮ ❖ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৬৪ ❖ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
২৯ জুন ১৮৭৩ ❖ মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু
২৯ জুন ১৯৩৮ ❖ বুদ্ধদেব গুহর জন্ম

২১ জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস

প্রবন্ধ

যোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য

রাউফুন নাহার

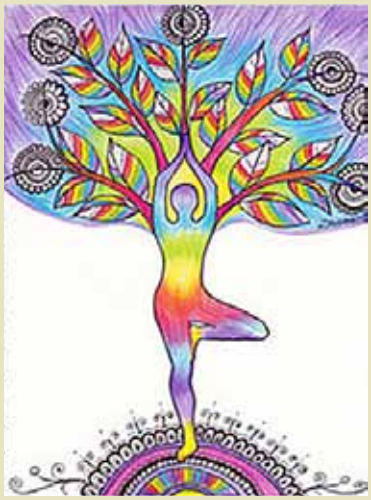

যোগের সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক অনবদ্য, হোক তা শারীরিক কিংবা মানসিক। না, এটি কারোর ব্যক্তিগত মতামত নয়, বরং বিশ্বের অনেক বড় বড় গবেষণার ফলাফল। যোগের সঙ্গে শরীর বা শারীরিক স্বাস্থ্যের কি ধরনের সম্পর্ক থাকতে পারে, তা সহজেই আন্দাজ করে নেওয়া যায়। কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে যোগের সম্পর্ক ঠিক কেমন, তা নিয়ে বলার শেষ নেই।

বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল বলছে, যোগচর্চায় মানুষ শারীরিকভাবে যেমন শক্তিশালী ও নিরোগ থাকে, তেমনি মানসিক ভাবেও শক্তিশালী ও নিরোগ থাকে।

এখন প্রশ্ন হল, মানসিকভাবে শক্তিশালী ও নিরোগ থাকা বলতে কি বোঝায়? সে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাইলে যোগ এবং মানসিক স্বাস্থ্য দুটি বিষয় সম্পর্কেই পরিষ্কার ধারণা দেবার প্রয়োজন আছে। কেন-না দুটি বিষয়েই মানুষের ধারণা অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ, অন্তত বাংলাদেশে।

তাত্ত্বিক আলোচনায় যাবার আগে একটু সহজ সরলভাবেই বিষয়টি বলা যেতে পারে। ধরুন আপনি কোথাও মৌখিক পরীক্ষা দিতে গেছেন। পরীক্ষাকক্ষে ঢোকার আগে আপনার ভীষণ ভয় বা নার্ভাস লাগছে। আপনি যা প্রস্তুতি নিয়েছেন তার কিছুই মনে পড়ছে না। ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস কমে শূন্যের কোটায় নেমে গেছে। সেই মুহূর্তে একটি ব্রিদিং এক্সারসাইজ (গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস) ম্যাজিকের মত কাজ করবে। অর্থাৎ আপনার ভয় কমতে শুরু করবে, প্রস্তুতি হিসেবে যা পড়েছিলেন তা ধীরে ধীরে মনে পড়ে যাবে এবং আত্মবিশ্বাসও বাড়তে শুরু করবে। ছোট্ট এই ঘটনাটিতেই কিন্তু যোগের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক উঠে এসেছে। অর্থাৎ এখানে ভয়, স্মৃতিভ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি হল এক একটি মানসিক অবস্থা যা ওই মুহূর্তে আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, আর ব্রিদিং এক্সারসাইজটি হল যোগের একটি অংশ যা আপনাকে এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করেছিল। অর্থাৎ সেই মুহূর্তে আপনি অনেক কিছু ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন, ফলে নিজের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আর শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে আপনি বাইরে থেকে শক্তি নিয়ে নিজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং নিজেকে উজ্জীবিত করেছিলেন।

শুধুমাত্র এই ধরনের সংকট মুহূর্তেই যে যোগ কাজে আসে তা নয় বরং যোগের নিয়মিত চর্চা আমাদেরকে মানসিকভাবে দৃঢ়, শক্তিশালী, ও আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর যোগের সুনির্দিষ্ট এবং গবেষণালব্ধ কিছু প্রভাব উল্লেখ করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে, যেমন–

- যোগ চর্চায় মনোযোগ এবং একাগ্রতা বাড়ে
- স্মৃতিশক্তি বা মনে রাখার ক্ষমতা বাড়ে
- কিছু শেখার আগ্রহ-উদ্দীপনা এবং ক্ষমতা বেড়ে যায়
- স্ট্রেস বা মানসিক চাপ কমে যায়
- বিষণ্নতা এবং মনমরা ভাব কমে যায়
- উদ্বেগ ও অস্থিরতা কমে গিয়ে স্বস্তি ও স্থিরতা ফিরে আসে
- শরীর ও মনের সংযোগ ঘটে
- শরীর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও বিভিন্ন ধরনের আবেগ-অনুভূতির শারীরিক পরিবর্তনগুলো জানা যায়। ফলে কঠিন ও কষ্টদায়ক আবেগগুলো দ্রুত সনাক্ত করে সেগুলোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা যায়। যেমন, শরীরে রাগের অনুভূতি সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলে তার ব্যবস্থাপনা সহজ হয়ে যায়
- ঘুম ভাল হয় বা ঘুমের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে
- আত্মবিশ্বাস ও মানসিক প্রশান্তি বাড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্যে যে-কোন ধরনের শারীরিক ব্যায়াম বা শরীরচর্চারই ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে। কেন-না শরীরচর্চার মাধ্যমে কষ্টকর অনুভূতি সৃষ্টিকারী ব্রেইন কেমিক্যালগুলোর নিঃসরণ কমে যায় এবং সুখ ও আনন্দের অনুভূতি সৃষ্টিকারী ব্রেইন কেমিক্যালগুলোর নিঃসরণ বেড়ে যায়। কিন্তু যোগকে স্রেফ শরীরচর্চার একটি ধরন মনে করা হলে বিরাট বড় ভুল হবে! বরং এটি হল অত্মি-সচেতনতা বৃদ্ধি করে জীবনকে সত্যিকার অর্থে যাপন করার অন্যতম একটি মাধ্যম। সহজভাবে বললে যোগের শব্দগত অর্থ হল যোগ বা সংযোগ। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গভঙ্গি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিজের প্রতি মনোনিবেশ করা এবং নিজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা। আরেকভাবে বলা যায়, যোগ হল পৃথিবীর অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডার থেকে নিজের ভেতরে শক্তি যোগ করে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া।

জীবনে সুখী ও সফল হবার উদ্দেশ্যে আমরা অনেক অনেক অর্জন চাই। সেই অর্জনগুলির পেছনে ছুটতে ছুটতে আমাদের ভেতরের শক্তিগুলো ক্রমশই বাইরের দিকে ধাবিত হতে থাকে। অর্থাৎ শক্তির বিয়োগ ঘটতে থাকে। এমনিভাবে চলতে চলতে আমাদের শক্তি ফুরোতে থাকে কিন্তু আমরা থামি না। ফলে নিজের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বেড়েই চলে। যোগ আমাদের নিজের কাছে ফিরতে শেখায়। আর ঠিক এ কারণেই যোগের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যের সম্পর্ক এতটা গভীর। বেলাশেষে 'আমি কে', 'কেন আমি এই পৃথিবীতে', 'কি আমার জীবনের উদ্দেশ্য' এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানা না থাকলে ছুটতে থাকা এই আমরা জীবন নিয়ে অর্থহীনতায় ভুগব সেটাই ভবিতব্য। যোগের দর্শন আমাদের সেই সত্যগুলোকেও উপলব্ধি করতে সাহায্য করে।

তবে সম্ভবত যে গের সবচেয়ে বড় সুবিধাজনক দিক হল, এটিকে কেউ শুধু শরীরচর্চার মাধ্যম হিসেবে নিতে পারে, কেউ শুধু মানসিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি বা আবেগ ব্যবস্থাপনার হাতিয়ার হিসেবে নিতে পারে, আবার কেউ-বা আধ্যাত্মসাধন বা জীবনের প্রকৃত অর্থ খোঁজার মাধ্যম হিসেবেও নিতে পারে। যার যতখানি ইচ্ছা এবং প্রয়োজন সেভাবেই যোগের ব্যবহার করতে পারে।

কাউন্সেলিং এবং সাইকোথেরাপির অনেকগুলো অ্যাপ্রোচ বা ঘরানা আছে। সেগুলোর ভেতরে ছোট ছোট অনেকগুলো টুল বা টেকনিকের সঙ্গে যোগেরও শক্তিশালী স্থান আছে। যেমন, রিল্যাকজেশন হিসেবে বিভিন্ন ব্রিদিং এক্সারসাইজ ছাড়াও, বহুল ব্যবহৃত একটি রিল্যাকজেশন হল 'প্রগ্রেসিভ মাসকুলার রিল্যাকজেশন' যা যোগেরই একটি সম্মিলিত রূপ। এটি বেশ কিছু মানসিক রোগ, যেমন, অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার, ডিপ্রেশন, ইনসোমনিয়া, ট্রমা এন্ড স্ট্রেস রিলেটেড ডিসঅর্ডার ইত্যাদির চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। তেমনি 'বডি ফোকাসড সাইকোথেরাপি' নামে আলাদা এক ধরনের সাইকোথেরাপিই আছে যেখানে শরীরের মাধ্যমেই মনের ক্ষত সারানো হয়। এখানে রয়েছে যোগের সর্বাধিক ব্যবহার। আবার 'মাইন্ডফুলনেস বেসড কগনিটিভ থেরাপি' নামে আরেক ধরনের থেরাপি আছে যা মূলত যোগের দ্বারাই প্রভাবিত।

কেউ কোন মানসিক সমস্যায় ভুগলে কিংবা একা সমাধান করতে পারছে না এমন কোন সমস্যায় পড়লে আমাদের (কাউন্সেলরের) কাছে আসে। আমরা মনোযোগ দিয়ে তাদের জীবনের গল্পগুলো শুনি। বেশিরভাগ গল্পেই থাকে ব্যর্থতা, রাগ, অভিমান, কষ্ট, হতাশা, বিষণ্নতা, কিংবা আত্মগ্লানির বোঝা। থাকে বিচ্ছেদের হাহাকার। নিজের কাছ থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা সেই মানুষগুলোকে আমরা সংযুক্ত হতে সাহায্য করি। প্রথমে তাদের নিজের সঙ্গে, তারপর অন্যদের সঙ্গে! নিজের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেই মূলত যোগের প্রয়োজন। কাউন্সেলিং সেটিং ছাড়াও যারা নিয়মিত যোগ চর্চা করে, তাদের মানসিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি থাকে এবং সার্বিক মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

আসুন, নিয়মিত যোগচর্চার মাধ্যমে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত হই!

রাউফুন নাহার
এমএস, কাউন্সেলিং সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধ

যোগবলে রোগ-আরোগ্য

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী

বিজ্ঞানের জোরে মানুষ আজ অসাধ্য সাধন করছে। মানুষ আকাশে উড়ছে। অচিন্ত্যনীয় বেগে মহাকাশ ঘুরে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে। সমুদ্রের অতল তলে মানুষ অবাধে বিচরণ করছে। চন্দ্রলোক, শুক্র ও মঙ্গলগ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনা মানুষ রূপায়িত করছে। কিন্তু এই মানুষই আবার জরা ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর অধীন হয়ে অসহায় জীবনযাপন করছে– এটা মানুষের পক্ষে অগৌরবের। মানুষকে এই অগৌরবের হাত থেকে, এই জরা ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায় কিনা, মৃত্যুকে মানুষের ইচ্ছাধীন করা যায় কিনা– এই ভাবনায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা ভাবিত হয়েছিলেন। ওষুধের সাহায্যে মানুষকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায় না। একমাত্র ভারতীয় যোগবিদ্যার সাহায্যে হয়তো মানুষ এই ব্যাধি জরা ও অকালমৃত্যু জয় করতে পারে– এই ধারণা নিয়ে যোগবিদ্যার গবেষণার শুরু।

যোগশাস্ত্রে যেসব কঠিন ধৌতি, বস্তি ও কুম্ভক-প্রাণায়ামাদি আছে তার অনুশীলন সর্বসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য সর্বসাধাণের পক্ষে উপযোগী করে নতুন যৌগিক ক্রিয়াদি উদ্ভাবনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে জাগে।

ভারতের সুদূর পূর্ব সীমান্ত আসামের নিভৃত আশ্রমে বসে আমরা আমাদের এই যোগবিদ্যার গবেষণা অনেক বছর আগে শুরু করি। আমাদের এই গবেষণার ফলেই মহোপকারী সহজ যৌগিক ক্রিয়া উদ্ভাবনে আমরা সক্ষম হয়েছি। যোগের কঠিন ধৌতি–বস্তিক্রিয়াকে আমরা সহজসাধ্য ধৌতি-বস্তিক্রিয়ায় রূপান্তরিত করেছি। কঠিন ও বিপজ্জনক কুম্ভক প্রাণায়ামের পরিবর্তে সাধারণের পক্ষে মহোপকারী সহজ প্রাণায়াম ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম প্রচলন করেছি। আমদের আবিষ্কৃত সহজ অগ্নিসারক্রিয়ায় আমাশয় ও পেটের অসুখ দ্রুত সেরে যায়।

এই সহজ অগ্নিসারক্রিয়াটি বিপজ্জনক কলেরা রোগেরও অব্যর্থ প্রতিষেধক। আমাদের প্রচলিত ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়াম সর্দি, কাশি, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি রোগ অনায়াসে ভাল করে। এই প্রাণায়াম অভ্যাস থাকলে কখনো জ্বর দেহকে আক্রমণ করতে পারে না। এই সহজ প্রাণায়ামাদি টাইফয়েড, নিউমোনিয়া এবং যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগেরও অব্যর্থ প্রতিষেধক।

রক্তচাপবৃদ্ধি, হৃদরোগ প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগও আমাদের যৌগিকপন্থায় অল্পায়াসে ভাল হয়। করোনারি থ্রম্বসিস এবং ক্যানসারের মত দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্যেও এই সহজ যৌগিক প্রক্রিয়ার সুফল দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি।

এখন আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি–

জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধের সহজতম উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সকলের পক্ষেই করায়ত্ত করা সম্ভব। সবাই যদি এই সহজ যৌগিকপন্থা গ্রহণ করে, তা হলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমুদয় মানুষই ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জয় করে ইচ্ছমৃত্যুকে আয়ত্ত করতে পারবে।

মানুষের অধিকাংশ রোগের সৃষ্টি হয় পথ্যের ত্রুটির জন্য; সুতরাং পথ্যব্যবস্থা নির্ভুল হওয়াও বাঞ্ছনীয়। এজন্য যোগবিদ্যা অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য বিষয় নিয়েও আমাদের গবেষণা করতে হয়েছে। খাদ্য বিষয়ে আমাদের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা আমরা আমাদের *খাদ্যনীতি* নামের বাংলা গ্রন্থে এবং *Arrange Right Diet for Human Beings* নামের ইংরেজি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি। এই বই দু'টি বর্তমান যুগের খাদ্যবিজ্ঞানের গবেষণার আলোকে এমন সুযুক্তির সঙ্গে লেখা যে তা পড়লে পথ্য সম্বন্ধে আর কোন দ্বিধা থাকবে না।

মানুষের আবির্ভাবের আদি যুগ থেকে রোগাক্রমণ প্রতিরোধের ভাবনা মানবমনে উদিত হয়েছে। এই ভাবনাই ওষুধ আবিষ্কারে পরিণতি লাভ করেছে। ত্রিবিধ ওষুধ মানুষ আবিষ্কার করেছে– উদ্ভিজ্জ, ধাতুজ ও প্রাণিজ। ওষুধ আবিষ্কার করেও তার ফলাফল সম্বন্ধে মানুষ নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। দেহতত্ত্বজ্ঞান, দেহযন্ত্রের সমুদয় কার্যকারিতার জ্ঞান মানুষের সীমাবদ্ধ; কতকটা অনুমানের ওপর নির্ভর করে চিকিৎসককে ওষুধ প্রয়োগ করতে হয়। এজন্যই আমাদের দেশে একটা বিদ্রুপাত্মক প্রবাদ আছে– 'শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসক'। অনুমানের ওপর নির্ভর করে ওষুধ প্রয়োগে একশো রোগীর প্রাণনাশের পর ওষুধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ 'বিদ্যা' অর্জিত হয়, এজন্যই এদের নাম বৈদ্য। ওষুধ প্রয়োগে সহস্র রোগীর প্রাণনাশের পর যারা ওষুধ সম্বন্ধে অধিকতর 'চেতনা' লাভ করেন, তারাই চিকিৎসক নামে খ্যাত হন।

যারা অসুখ হলেই ওষুধ ও চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, রোগ তাদের সঙ্গ ছাড়ে না। এক অসুখ ভাল হওয়ার কিছুদিন পরই আবার তারা অন্য অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। এভাবে বারবার অসুখে ভুগে তারা অকালমৃত্যু বরণ করে। ওষুধের এই সুদূরপ্রসারী কুফল লক্ষ্য করে একদল বিচক্ষণ লোক উদ্বেগ বোধ করতে লাগলেন, ওষুধের ওপর এরা বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলেন। পশু-পাখি প্রভৃতির রোগারোগ্য প্রণালী এরা লক্ষ্য করতে লাগলেন। গৃহপালিত কুকুরটি মাঝে মাঝে এক-একদিন উপবাস দেয়, তার অতিপ্রিয় খাদ্যও সে স্পর্শ করে না। রেদের মাঝাখানে গিয়ে কুকুরটি নিঃশব্দে পড়ে থাকে। একবেলা বা একদিন এরূপ রৌদ্রস্নান করে ও উপবাস দিয়ে কুকুরটি সতেজ হয়ে ওঠে। আবার সে আগের মত খাবার খায় এবং ছোটাছুটি করে ফুর্তিতে দিন কাটায়। ঘরের বিড়ালটিও মাঝে মাঝে এরূপ এক-আধদিন কিছুতেই খাদ্য স্পর্শ করে না, কতকগুলি দুর্বা ঘাস চিবিয়ে কয়েকবার বমি করে। গৃহপালিত গরুটি জ্বরাক্রান্ত হলে কিছুতেই ঘাস খায় না; জলাশয়ের পাশে গিয়ে নির্জীবভাবে পড়ে থাকে এবং প্রায়ই প্রতিঘণ্টা অন্তর জলাশয়ের কাছে গিয়ে প্রচুর জলপান করে। এভাবে একদিন বা দুদিন জলপানসহ উপবাস দিয়ে গাভীটি আবার সুস্থ-সবল হয়ে ওঠে।

পশু-পাখির এই রোগারোগ্য পদ্ধতি লক্ষ্য করেই ওষুধ-বিতৃষ্ণ ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কারের প্রেরণা লাভ করেন। এর ফলে অতিপ্রাচীন বৈদিক যুগ থেকেই আতপচিকিৎসা, জলচিকিৎসা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। এই প্রাকৃতিক চিকিৎসার জয়গান বৈদিক সাহিত্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। ওষুধ-চিকিৎসা ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা প্রণালী অতি প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত পাশাপাশি চলে আসছে। প্রাচীন যুগের ঋষিদের অহিংসা, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ যেমন ব্রাহ্মণদের কূটবুদ্ধি, ক্ষাত্রশক্তির দাম্ভিকতা ও ক্ষমতালিপ্সা এবং বৈশ্যশক্তির ধনলুব্ধতার কারণে আজ পর্যন্ত জগতে বাস্তবায়িত হয়নি– চিকিৎসা জগতেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে চলেছে। ওষুধ আবিষ্কারকদের বিজ্ঞাপন ও বাগাড়ম্বরের ফলে প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি আমাদের চেতনা থেকে ক্রমশ পরিত্যাজ্য হচ্ছে। কোন বিষয় নিয়ে গভীরভাবে ভাবনার অভ্যাস জনসাধারণের নেই, গতানুগতিক পথে চলতেই তারা ভালবাসে। বাগাড়ম্বর ও বিজ্ঞাপন দিয়ে তাই জনসাধারণকে সহজেই প্রতারিত করা যায়। এজন্যই প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি বর্তমান যুগে অজ্ঞাত ও অখ্যাত হয়ে আছে। মুষ্টিমেয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ এগুলো অনুসরণ করেন না।

আমাদের 'যৌগিক চিকিৎসা পদ্ধতি' প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিরই পূর্ণাঙ্গরূপ। ওষুধ রোগ আরোগ্য করে, কিন্তু আবার ঐ উদরস্থ ওষুধবিষেই নতুন রোগের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে পরিমিত উপবাস, জলধৌতি, কাদামাটির প্রলেপ, আতপস্নান প্রভৃতি অবলম্বনেও রোগ আরোগ্য হয়; কিন্তু ওষুধের মত পরিণামে তা দেহের পক্ষে অনিষ্টকর হয় না; ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যলাভেরও প্রতিবন্ধকতা করে না। কাজেই ওষুধ চিকিৎসার চেয়ে প্রাকৃতিক চিকিৎসা মানুষের দেহের পক্ষে অধিকতর কল্যাণজনক– যদিও এর অভ্যাস একটু বিরক্তিজনক এবং সময়সাপেক্ষ। কিন্তু এই প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতিরও ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এটা সাময়িকভাবে রোগ দূর করে, কিন্তু ভবিষ্যৎ রোগাক্রমণ প্রতিরোধে খুব সহায়তা করতে পারে না; দেহের দুর্বল যন্ত্রগুলোকে স্থায়ী সবলতা দান করতে পারে না। অথচ যৌগিক চিকিৎসা যেমন রোগ আরোগ্য করতে পারে, তেমনি ভবিষ্যৎ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতাও তার অসাধারণ। যৌগিক আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসে স্নায়ু পেশী, ধমনী, গ্রন্থি, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি দেহপরিচালক যন্ত্রগুলো এমন সবল, এমন প্রাণবান হয়ে ওঠে যে কোন রোগবিষ বা রোগজীবাণু দেহে ঢুকে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায় না। এজন্যই যৌগিক চিকিৎসা সমগ্র চিকিৎসা প্রণালীর সেরা হওয়ার যোগ্য বলে আমরা মনে করি।

যোগীরা দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে সুগভীর ও নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারছিলেন বলেই এ সর্বজনহিতকর যোগবিদ্যা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। বর্তমান যুগে গ্রন্থিতত্ত্ব ও গ্রন্থির অন্তর্মুখী রসের ক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে যুগান্তর উপস্থিত করেছে। পঞ্চাশ বছর আগেও পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান এই গ্রন্থিতত্ত্ব সম্বন্ধে খুব কমই জানত। অথচ যোগীরা বহু সহস্র বছর আগেই এই গ্রন্থিক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে এই গ্রন্থিগুলিকে সবল-সুস্থ রাখার উপযোগী সহজ যৌগিক ক্রিয়া আবিষ্কার করে গিয়েছেন। আমাদের ঋষিদের আবিষ্কৃত এই যোগবিজ্ঞান সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু, সমগ্র বিশ্বের অমূল্য সম্পদ।

রোগ আরোগ্য করার চেয়ে রোগ সৃষ্টি হতে না দেওয়ার ব্যবস্থা করাই চিকিৎসাশাস্ত্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষকে এই লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র যৌগিক ক্রিয়ারই আছে। ৫ বছরের শিশু থেকে ৯০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সব বয়সের নরনারীর উপযোগী সহজ সহজ যৌগিক ক্রিয়া আছে। খাওয়া-দাওয়ায় সংযত থেকে, সুষম পথ্য বা আদর্শ পথ্য গ্রহণ করে মাঝে মাঝে কিছু সময় যৌগিক আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান করলে আমরণ দেহকে নীরোগ রাখা যায়, আমরণ যৌবনকে অটুট রাখা যায়। এরকম মহোপকারী যোগপদ্ধতি স্বাধীন ভারতের স্বাস্থ্যহীন ভারতবাসীর ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক– এ-ই আমাদের উদ্দেশ্য।

যোগবলে রোগ-আরোগ্য বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট আছে। বহু রুগ্ন ছেলে-মেয়ের ওপর আমরা যোগবিদ্যার ফলাফল পরীক্ষা করেছি। স্বাস্থ্যরক্ষায় যোগবিদ্যার ফলাফল সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দেশের সেবায় লাগুক, স্বাস্থ্যহীন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ের আবির্ভাব হোক, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু মানবসমাজ থেকে নির্বাসিত হোক– এই শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়েই আমাদের যোগবলে রোগ-আরোগ্যের চেষ্টা ও গবেষণা। যৌগিক চিকিৎসা প্রণালী এবং পথ্যবিধি অনুসরণ করে প্রত্যেক রোগীই রোগমুক্ত হতে পারবেন– এতে কোন সংশয় নেই।

যোগাসনের নামে অনেকেই ভয় পায়। অনেকের এ সম্বন্ধে ভুল ধারণা আছে। যোগশাস্ত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নয়, এটা অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা আত্মদর্শন শাস্ত্র।

বাঙালি জাতির মধ্যে দীর্ঘায়ুর সংখ্যা অতি নগণ্য। সিঁদুরশোভিত শুভ্র সীমন্তিনীর দর্শন বাঙালি সমাজে দুর্লভ, অধিকাংশ বাঙালি পুরুষকেই অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়। সাধারণের অকালমৃত্যুর ক্ষতি কোনরকমে পূরণ হয়, কিন্তু জাতির যাঁরা মহামনীষী, যাঁদের শক্তি ও কর্মদক্ষাতর ওপর জাতির উন্নতি, জাতির কল্যাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে তাঁদের অকালমৃত্যু জাতির পক্ষে মহাবেদনাদায়ক, মহাদুর্ভাগ্যের বিষয়। বাঙালিদের সম্বন্ধে আমরা যা বলছি, বাংলার প্রতিবেশী আসাম ও উড়িষ্যাবাসীদের জন্যও তা একইভাবে প্রযোজ্য।

অনতিদূরকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, দেশবরেণ্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশবরেণ্য মহাপুরুষ অকালমৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁদের অকালমৃত্যুতে শুধু বাঙালি নয়, সমগ্র ভারতেরই ক্ষতি হয়েছে। এরকম অকালমৃত্যু জয় করে আমরণ নীরোগ দেহ লাভের পথ, শতায়ুলাভের জন্য চাই যোগবলে রোগ-আরোগ্য।

আমাদের ঋষিদের আবিষ্কৃত এই সহজসাধ্য যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও নিয়ম-পথ্যদি পালন করলে সর্বব্যাধিমুক্ত দেহ লাভ করা যায়, জরা ও অকালমৃত্যু জয় করা যায়, উদার ও উন্নত মনের অধিকারী হওয়া যায়।

বহুমূত্র রোগ

লক্ষণঃ বহুমূত্র রোগ দ্বিবিধ– শর্করাযুক্ত বহুমূত্র (Diabetes Mellitus) এবং শর্করাবিহীন বহুমূত্র (Diabetes Insipidus)। শর্করাযুক্ত বহুমূত্রের প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় নাম সোমরোগ; শর্করাবিহীন বহুমূত্রের নাম উদক মেহ বা মূত্রাতিসার।

'...মূত্রস্থা মক্ষিকাদ্যাঃ' প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি বের হতে আরম্ভ করলেই প্রস্রাবে মশা-মাছি ঘোরাফেরা করে। সুতরাং প্রস্রাবে মাছি ও পিঁপড়ে বসতে দেখলেই এই রোগ সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এ রোগের অন্যান্য লক্ষণ– ঘন ঘন পিপাসা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া; মুখে মিষ্টিভাব অনুভব, সময় সময় সমস্ত শরীরে অসহ্য চুলকানির সৃষ্টি হয় অথবা দুষ্ট ব্রণের উদ্ভব হয়। রোগের কঠিন অবস্থায় মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা, মূর্চ্ছা, প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া প্রভৃতি যন্ত্রণাদায়ক উপসর্গ সৃষ্টি হয়। বহুমূত্ররোগীর দেহকে হৃদরোগ, সন্ন্যাস রোগ প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি সহজেই আক্রমণ করতে পারে। যাদের চোখে ছানি পড়ে, প্রায়ই দেখা যায় তারাও অল্পাধিক পরিমাণে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত। বহুমূত্র রোগীর হয় কোষ্ঠবদ্ধতা, নয়তো কোষ্ঠতারল্য বিদ্যমান। তার গায়ের চামড়া শুষ্ক, দাঁতগুলো ফ্যাকাশে বা ময়লা হয়ে যায়। এক কথায় বলা যায়– বহুমূত্র রোগ দুরারোগ্য কঠিন অজীর্ণ রোগেরই প্রকার বিশেষ।

কারণঃ যোগশাস্ত্রের ভাষায় অগ্নিগ্রন্থির দুর্বলতাই বহুমূত্র রোগের প্রধান কারণ। সূর্যগ্রন্থি (Pancreas) এবং যকৃৎ অগ্নিগ্রন্থির প্রধান গ্রন্থি। এই গ্রন্থি দুটির কাজ বিপর্যস্ত হলে বহুমূত্র রোগ সৃষ্টি হয়। সূর্যগ্রন্থির অন্তর্নিঃসৃত রসের একাংশ প্রবাহিকা নাড়ী অর্থাৎ উর্ধ্ব অন্ত্রে সঞ্চিত খাদ্যবস্তুকে জীর্ণ করে, এর অন্তর্নিঃসৃত রসের আরেক অংশ খাদ্যবস্তু থেকে গ্লুকোজ বা চিনি তৈরি করে তা সূর্যগ্রন্থিকোষে সঞ্চিত রাখার ব্যবস্থা করে। এই সঞ্চিত চিনিই প্রয়োজনমত দগ্ধ হয়ে দেহের তাপ, দেহস্থ পেশী, তন্তু ও স্নায়ুর জীবনীশক্তি অটুট রাখে।

এই সূর্যগ্রন্থি ও যকৃতের ক্রিয়া দুর্বল হয়ে পড়লে যকৃৎ আর প্রয়োজনানুরূপে বণ্টনের জন্য চিনি তার কোষে সঞ্চিত করে রাখতে পারে না। এই চিনি রক্তে যথেচ্ছাভাবে ঢুকে রক্তের ক্ষারভাগ (alkalinity) নষ্ট করে দেয়। ফলে রক্ত তখন সমস্ত দেহযন্ত্রকে বিশুদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করতে পারে না। রক্তের ক্ষারধর্ম নষ্ট হলে রক্তের রোগবিষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও দ্রুত হ্রাস পায়। দেহপ্রকৃতি তখন রক্তমিশ্রিত এই অপ্রয়োজনীয় এবং অনিষ্টকারী চিনিকে তরল করিয়ে মূত্রগ্রন্থির (kidney) সাহায্যে ছেঁকে প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। রক্তের চিনিকে তরল রাখার জন্য দেহে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়– এজনই বহুমূত্ররোগীর বার বার জলের পিপাসা লাগে এবং জলই আবার প্রস্রাবরূপে শরীর থেকে অনিষ্টকারী চিনি বের করে দেয়। প্রস্রাবে চিনি থাকে বলেই তাতে মাছি ও পিঁপড়ে বসে।

সূর্যগ্রন্থি বা অগ্ন্যাশয়ের অন্তঃস্রাবী রসকে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র নাম দিয়েছে ইনসুলিন। গরু, ভেড়া প্রভৃতি জীবজন্তুর সূর্যগ্রন্থি থেকে এই ইনসুলিন সংগ্রহ করা হয়। ইনসুলিন ইনজেকশন নিলে সাময়িকভাবে রক্তে চিনির অংশ হ্রাস পায়। বলাবাহুল্য, ইনসুলিন ইনজেকশনে বহুমূত্ররোগ কখনো আরোগ্য হয় না। তবে রোগের প্রবলতার সময় ঘন ঘন ইনজেকশনের সাহায্যে রোগীকে ৫/১০ বছর বা ততধিক কাল বাঁচিয়ে রাখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে আগে রোগীকে জীবনের আশা ত্যাগ করতে হত; বর্তমানে ইনসুলিন আবিষ্কার হওয়ায় রোগীর সহসা প্রাণনাশের আশঙ্কা কিছুটা কমেছে মাত্র।

অনেক সময় মূত্রথলি আহত হলেও যকৃৎ-কোষের কিছু চিনি মূত্রথলিতে এসে মূত্রথলির আহত স্থান দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বের হয়ে যায়। সুতরাং মূত্রথলি আহত হলেও প্রস্রাবে চিনি পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এটা সোমরোগ বা বহুমূত্ররোগ নয়। এটা ভিন্ন রোগ। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে এর নাম রেনাল গ্লাইকোসুরিয়া। সাধারণ ডাক্তারেরা ভুলক্রমে এই রোগকেও বহুমূত্র মনে করে ইনসুলিন ইনজেকশন দেন। এর ফলে ইনসুলিন বিষে হতভাগ্য রোগী অবিলম্বে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দাম্পত্যজীবনে উচ্ছৃঙ্খলতায় রক্ত নিস্তেজ হয়ে অগ্নিগ্রন্থির ক্রিয়া দুর্বল হলে এ রোগ সৃষ্টি

হতে পারে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনাও অগ্নিগ্রন্থিগুলোকে দুর্বল করে এই রোগ সৃষ্টি করতে পারে। যারা অতিরিক্ত চা পান করে অথবা প্রতিদিন ক্ষীর, সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি চিনিযুক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার খান তাদের শরীরে প্রয়োজনাতিরিক্ত চিনি সঞ্চিত হওয়ার ফলেও এই রোগ সৃষ্টি হতে পারে। অতিরিক্ত মাছ, মাংস বা ডিম খেলে বা অতিরিক্ত ঘি, মাখন ও ঘিয়ে ভাজা জিনিস খেলে যকৃৎ ও প্লীহা দুর্বল হলেও এই রোগ সৃষ্টি হয়। অন্যান্য কারণেও স্বাস্থ্যভঙ্গ হলে এ রোগের উদ্ভব হতে পারে।

চিকিৎসাঃ (ভোরে) সহজ বস্তিক্রিয়া ও তদনুষঙ্গী আসন-মুদ্রাদি। তারপর প্রাতঃকৃত্যাদি ও অর্ধস্নান; সহজ অগ্নিসার ৩০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং ২০বার, ২নং ৬বার; সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, নং ৮, বারিসার ধৌতি বা বমন-ধৌতি।

(দুপুরে) স্নানের সময় সহজ অগ্নিসার ২৫ বার, অগ্নিসার ধৌতি নং ১, নং ২।

(সন্ধ্যায়) ভ্রমণ প্রাণায়াম, যোগমুদ্রা, পশ্চিমোত্তান, সহজ অগ্নিসার। সহজ প্রাণায়াম নং ১, নং ২, নং ৩, নং ৪; বিপরীতকরণী, পবনমুক্তাসন।

ক্রমবর্ধমান ব্যায়াম এবং আতপস্নান। আহারান্তে ডান নাকে এক ঘণ্টা শ্বাস প্রবাহ অব্যাহত রাখা।

নিয়ম ও পথ্যঃ বহুমূত্র রোগের মূলে আছে অজীর্ণ। এই রোগে যকৃতের ক্রিয়া দুর্বল থাকে বলে শরীরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় চর্বি পুড়ে যেতে পারে না– ফলে বহুমূত্র রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই স্থূলকায় হয়। রোগের শুরু বোঝা গেলে উপর্যুপরি ২/৩ দিন না খেয়ে থাকতে হবে। না খেয়ে থাকার সময় প্রচুর পরিমাণে জলপান করতে হবে; অন্য কোন খাবার খাওয়া যাবে না। এরকম সম্পূর্ণ উপবাসে অক্ষম হলে অনাহারে থাকার সময় প্রয়োজনমত পাকা হলুদ ফল অর্থাৎ কমলা, আনারস, আঙুর, ডালিম ইত্যাদি খাওয়া যাবে। এভাবে রোগের শুরুতে ২/৩ দিন না খেয়ে থাকলেই রক্তে চিনির ভাগ কমে যাবে এবং প্রস্রাবেও চিনির ভাগ হ্রাস পাবে অথবা একেবারেই চিনি পাওয়া যাবে না। এরপর খাওয়া-দাওয়ায় বিশেষ সংযমী হতে হবে। সবসময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে খাওয়া-দাওয়ার কারণে অজীর্ণ বা অম্ল সৃষ্টি না হয়, পাকস্থলীতে গ্যাস সৃষ্টি না হয় এবং খাদ্যবস্তুর সঙ্গে অতিরিক্ত চিনি পেটে না যায়।

কোন ওষুধেই এই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয় না। যৌগিক ক্রিয়া অভ্যাসে নতুন রোগ খুব দ্রুত আরোগ্য হবে। রোগ পুরনো হলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হতে একটু সময় লাগে। একাদশীর উপবাস, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিশিপালন পুরনো বহুমূত্র রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। বহুমূত্র রোগের প্রবল অবস্থায় ভাত ও রুটির পরিবর্তে কাঁচকলা সিদ্ধ, ওল সিদ্ধ বা মানকচু সিদ্ধ খাওয়া যাবে। চাল, আটা, সাগু, বার্লি প্রভৃতি শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য থেকে শরীরে চিনি তৈরি হয় এবং আমিষজাতীয় খাদ্যে বহুমূত্র রোগীর যকৃতাদি আরও খারাপ হয়। এ জন্যই এ রোগে আমিষ খাবার সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা উচিত। দই, নারিকেল প্রভৃতি খাবারেও প্রোটিন থাকে, কিন্তু এরা মাছ, মাংস ও ডিম প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাবারের মত অম্লধর্মী নয়, বরং শাক-সবজির মতই ক্ষারধর্মী। সুতরাং বহুমূত্ররোগী আমিষ খাদ্য বর্জন করে উপরোক্ত দই ও নারিকেল থেকে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রোটিন উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। পাকা কলা, বিলাতী বেগুন, থোড়, মোচা, ডুমুর এবং অন্যান্য শাক-সবজি, বিশেষভাবে টাটকা শাক-পাতা এবং টক ও মিষ্টি ফল এই রোগের জন্য উপকারী। চা, সিগারেট প্রভৃতি মাদকদ্রব্য যথা-সাধ্য বর্জন করতে হবে। ছানা, সন্দেশ ইত্যাদি

সংহত খাবার এবং ঘিয়ের তৈরি খাদ্যবস্তু এবং আমিষখাদ্য এ রোগে গ্রহণ করা উচিত নয়। এসব খাবার দেহে দূষিত জিনিস (ইউরিক এসিড) জমা করে রোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ

লক্ষণঃ রক্তবাহী ধমনীগুলি রুগ্ন ও দুর্বল হয়ে পড়লে স্বাভাবিকভাবে তার ভিতর দিয়ে রক্তস্রোত প্রবাহিত হতে পারে না; হৃদযন্ত্রকে অতিক্রিয় হয়ে, অধিক চাপ সৃষ্টি করে ধমনীতে রক্ত পাঠাতে হয়। এই অতিরিক্ত রক্তের চাপকেই বলে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ।

রাতে ভাল ঘুমের অভাব, রাতে ঘুমের সময় একাধিকবার প্রস্রাব, বামপাশ চেপে শোওয়ায় অস্বস্তিবোধ, কানের ভেতর একপ্রকার শব্দ শুনতে পাওয়া, সময় সময় মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা, সময় সময় শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা অনুভব প্রভৃতি রক্তচাপ বৃদ্ধি রোগের প্রাথমিক লক্ষণ।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রমতে রক্তের চাপ যদি ১৫৫ মিলিমিটারের বেশি হয়, তাহলে তাকে উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ (high blood pressure) বলে। রক্তের চাপ যদি ১১০ মিলিমিটারের নীচে থাকে, তবে তাকে নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ (low blood pressure) বলে। এখন রক্তচাপ মাপার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer)। ১২০ মিলিমিটার-এর সঙ্গে বয়সের পাঁচভাগ যোগ করলে যে পরিমাণ হয় তাই সুস্থ লোকের রক্তচাপের পরিমাণ। অন্য এক শ্রেণীর চিকিৎসকের মতে ১০০ মিলিমিটারের সঙ্গে বয়সের অর্ধেক যোগ করলে যে পরিমাণ হয়, তাই সুস্থ শরীরের রক্তচাপের পরিমাণ। এই হিসেবে ৬০ বছরের লোকের রক্তচাপের স্বাভাবিক পরিমাণ ১২০+ ১২ = ১৩২ মিলিমিটার। অন্য মতে ১০০ + ৩০ = ১৩০ মিলিমিটার।

কারণঃ খাদ্যের প্রোটিন শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণ করে। যাদের বয়স ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে এবং যৌবনেও যাদের কঠিন শারীরিক পরিশ্রম করতে হয় না, তাদের পক্ষে প্রোটিনের প্রয়োজন খুব অল্প। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতার দরুণ বা লোভের বশবর্তী হয়ে পরিশ্রমবিমুখ নরনারী যখন প্রতিদিনই অধিক পরিমাণে আমিষ ও নিরামিষ প্রোটিন খাবার গ্রহণ করে, তখন তাদের শরীরে অনেক অম্লবিষ (urea) জমা হয়। শরীরের পক্ষে জমাকৃত প্রোটিনের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এজন্য মানবদেহে প্রোটিন জমা রাখারর কোন ব্যবস্থাও নেই। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রোটিনকে শরীর থেকে বের করে দেওয়ার জন্য যকৃৎ এবং অন্যান্য পাচকরস উৎপাদক যন্ত্রগুলিকে বিশেষভাবে অতিক্রিয় হয়ে উঠতে হয়। প্রোটিন নিঃসরণে এই পাচকরসগুলির প্রাণপণ চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়, তখন এই প্রোটিন দেহের মধ্যে পচে শরীরে বিষ সৃষ্টি করে। ঐ বিষে শরীরের রক্ত দূষিত হয়। মূত্রগন্থি (kidney), যকৃৎ, ফুসফুস প্রভৃতি রক্তশোধনকারী যন্ত্রগুলিও ঐ বিষে জর্জরিত হয়ে যখন রুগ্ন ও দুর্বল হয়, তখন ওগুলোর আর দূষিত রক্তকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করার সামর্থ্য থাকে না। ঐ দূষিত রক্তের বিষপ্রভাবে ধমনী ও শিরাগুলির কোমলতা ও নমনীয়তা নষ্ট হয়ে যায় এবং ওগুলো শক্ত হয়ে ওঠে। এই রুগ্ন, দুর্বল ও শক্ত ধমনীগুলোর ভিতর দিয়ে রক্তস্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে পারে না– ফলে হৃদযন্ত্রকে অতিক্রিয় হয়ে জোরে রক্ত পরিচালনার জন্য অধিক বেগ অধিক চাপ প্রয়োগ করতে হয়। এই অধিক বেগ, অধিক চাপ উৎপন্ন করতে গিয়ে হৃদপিণ্ডকে অস্বাভাবিকভাবে স্পন্দিত হতে হয়। হৃদযন্ত্রের এই অতিক্রিয়তা এবং অস্বাভাবিক স্পন্দনই পরিণামে উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ সৃষ্টি করে।

যারা প্রতিদিন প্রয়োজনাতিরিক্ত চর্বিজাতীয় খাবার খায়, অতিরিক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার খায়, তারা যদি যথোচিত শারীরিক পরিশ্রম না করে, তবে তাদের দেহে জমাকৃত চর্বি পুড়তে পারে না। এজন্যই শরীরের অতিরিক্ত চর্বি জমা হয়ে এরা স্থূলকায় হয়ে ওঠে। স্থূলকায় ব্যক্তির বৃহদ্ধমনী, ক্ষুদ্রধমনী এবং রক্তবাহী শিরাগুলিতে মেদ জমা হয় এবং এর ফলে ধমনীগুলির রক্তস্রোতপথ সঙ্কুচিত হয়। প্রয়োজনীয় রক্ত এই সঙ্কুচিত পথে স্বাভাবিকভাবে যাতায়াত করতে পারে না– এজন্য হৃদযন্ত্রকেও অধিক বেগ, অধিক চাপ সৃষ্টি করে দ্রুত রক্ত প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং শরীরে মেদবৃদ্ধিও রক্তচাপবৃদ্ধি রোগের একটি প্রধান কারণ।

শরীরে অতিরিক্ত রক্ত সৃষ্টি না হলে মেদবৃদ্ধি হয় না। শরীরের এই অতিরিক্ত রক্ত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির কাম রিপুকে অধিকতর উগ্র করে তোলে। সুতরাং দেহে সঞ্চিত অতিরিক্ত রক্ত, অতিরিক্ত চর্বি শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতিকূল নয়, মানসিক স্বাস্থ্যেরও প্রতিকূল।

রক্ত উৎপাদক যকৃৎ, রক্তশোধনকারী মূত্রযন্ত্র, প্লীহা, ফুসফুস প্রভৃতি দূর্বল হয়ে পড়লে প্রয়োজনীয় সুস্থ রক্তের অভাবে দেহ দুর্বল হয়ে নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি রোগ সৃষ্টি হয়।

শরীরে সব সময় একটা ক্লান্তির ভাব, অনিদ্রা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা প্রভৃতি নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধির লক্ষণ। চলার সময় মাথা 'টলে যাওয়া' উচ্চ রক্তচাপবৃদ্ধির লক্ষণ।

চিকিৎসাঃ (ভোরে) ৩ নং সহজ বস্তিক্রিয়ার নিয়মে জলপান করে সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট, পবনমুক্তাসন ৪ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ১– ২মিনিট; প্রাতঃকৃত্যাদির পর টাববাথ ৫/১০ মিনিট।

টাবে বসে সহজ অগ্নিসার ৪০ বার, অগ্নিসার ধৌতি ১নং ৮ বার, ২নং ৪ বার, ভ্রমণ প্রাণায়াম এবং সহজ প্রাণায়াম।

(দুপুরে) টাববাথ ১৫-৩০ মিনিট, টাবে বসে অগ্নিসার ধৌতি ১নং ৮ বার, সহজ প্রাণায়াম নং ২, ৩, ৭– প্রত্যেকটি ২/৩ মিনিট; সহজ অগ্নিসার ৪০ বার।

(সন্ধ্যার পূর্বে) ভ্রমণ-প্রাণায়াম, টাববাথ ৪-৫ মিনিট, টাববাথের পরে বিপরীতকরণী বা সহজ বিপরীতকরণী ৩ মিনিট।

রক্তের চাপ হ্রাস পেলে কোষ্ঠবদ্ধতা, অম্ল প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। রক্তের চাপ ২২০ মিলিমিটারের বেশি হলে সহজ প্রাণায়াম, ভ্রমণ-প্রাণায়াম, সহজ অগ্নিসার ও অগ্নিসার ধৌতি ছাড়া অন্য কোন আসন-মুদ্রাদি অভ্যাস করা যাবে না।

নিয়ম ও পথ্যঃ অতি উত্তেজনার সঞ্চার হলে মস্তিষ্কের ধমনী ফেটে গিয়ে রোগীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হতে পারে। সুতরাং এই রোগে আক্রান্ত হলে কাম-ক্রোধের সবসময় বশে রাখতে হবে। জলপানবিধি যথাযথ অনুসরণ করে চলতে হবে। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত আমিষ খাবার, ছানা ও ছানাজাতীয় এবং চর্বিজাতীয় খাবার গ্রহণ বন্ধ রাখতে হবে। ভাত বা রুটি প্রভৃতিও খুব অল্প পরিমাণে খেতে হবে। ক্ষারধর্মী খাবারই এই রোগে সঠিক ওষুধ। শাক-সবজি, দুধ-ঘোল ও ফলমূল ক্ষারধর্মী খাবার। টক, মিষ্টি, রসাল, শুষ্ক– সব শ্রেণীর ফলই এই রোগে একাধারে পথ্য এবং অষুধ। শরীরে অতিরিক্ত চর্বি থাকলে দুধের পরিবর্তে ঘোল খেতে হবে। পাতে কাঁচা লবণ খাওয়া চলবে না। চিনি খাওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। চিনির পরিবর্তে অতি অল্প পরিমাণে গুড় বা মধু খাওয়া যাবে। অল্প ক্ষুধায় বা অক্ষুধায় কিছু খাওয়া যাবে না।

উপবাসে রক্তচাপ কমে। সুতরাং এ রোগে আক্রান্ত হলে সপ্তাহে একদিন উপবাস করতে হবে। প্রতি সপ্তাহে উপবাসে অক্ষম হলে, প্রতি একাদশী তিথিতে উপবাস এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় নিশিপালন করতে হবে অর্থাৎ ঐ রাতে আর কোন খাবার না খেয়ে শুধু ইচ্ছামত বিশুদ্ধ জল বা লেবুর রস মিশ্রিত জলপান করতে হবে। নিম্ন রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে উপবাসের সময় দুধ ও ফলাদি লঘুপথ্য গ্রহণ করা চলবে।

রক্তের চাপ ১৭০ মিলিমিটারের বেশি হলে উল্লিখিত টাববাথ বিধি বিশেষভাবে পালন করতে হবে। এরকম স্নান ও ভ্রমণ-প্রাণায়াম ও সহজ প্রাণায়ামাদি অভ্যাস করলে রক্তের চাপ নীচে নেমে আসবে।

স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী
ভারতের প্রখ্যাত যোগগুরু, যোগচিকিৎসার পথিকৃৎ

প্রবন্ধ

যোগসাধনের গুরুত্ব

প্রমিথিয়াস চৌধুরী

আমাদের দেহ, মন ও আত্মা আছে। তাই জীবনের যথার্থ উন্নতির জন্যে দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক– তিনেরই উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞজনের ভাষ্য, 'We should be physically fit, mentally strong and spiritually elevated'– আমাদের দৈহিক সুস্থতা অর্জন করতে হবে, মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ঘটাতে হবে। যোগ মানুষের এই ত্রিস্তরীয় উন্নতি ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে এটাই যোগের বৈশিষ্ট্য।

দৈহিক সুস্থতা: দৈহিক সুস্থতা মানে বিভিন্ন রোগ থেকে দেহকে মুক্ত রাখা। বলা হয়– 'Prevention is better than cure' অর্থাৎ রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা করার চেয়ে রোগের প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণই শ্রেয়। বিভিন্ন রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে আমরা চিকিৎসকের কাছে যাই– দামী দামী ওষুধ খাই। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেন, এ সব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতেও আবার নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিয়মিত যোগাসন করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে থাকতে পারি।

মানসিক উন্নতি: যোগের মাধ্যমে শুধু শারীরিক সুস্থতা নয়, মানসিক দুর্বলতা দূর করা এবং মনঃশক্তি অর্জন করাও সম্ভব। আমরা ভাল-মন্দ যা কিছু করি, প্রকৃতপক্ষে মনই এই সমস্ত কাজ করে। মন যদি ভাল হয়– শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, তাহলে সমস্ত কাজও ভাল হবে। আর মন যদি মন্দ হয়, অর্থাৎ অশুভবুদ্ধিসম্পন্ন হয় তাহলে কাজও মন্দ হবে। মন মস্তিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, বিভিন্ন গ্রন্থি, স্নায়ুকোষ, স্নায়ুতন্ত্র, ইন্দ্রিয়সমূহ তথা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সমস্ত কাজ করে।

আমাদের মন কতগুলি বৃত্তির সমাহার। এগুলির সংখ্যা প্রধানত ৫০টি। এগুলি মস্তিষ্কে ও সুষুম্নাকাণ্ডের মধ্যে বিভিন্ন চক্রে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রন্থিগুলির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, লোভ, ক্রোধ, আশা, চিন্তা, চেষ্টা, বুদ্ধি, বিবেক প্রভৃতি। সাধারণত মানুষের মধ্যে হীন বৃত্তিগুলি প্রবল ও উন্নত বৃত্তিগুলি অস্ফুট থাকে। যোগের যম-নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান প্রভৃতি প্রক্রিয়ার অনুশীলনের সাহায্যে বৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বৃত্তিগুলির যতই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, ততই মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, ততই মনের শক্তি বৃদ্ধি পাবে।

মানসিক একাগ্রতা: বিক্ষিপ্ত সূর্যরশ্মিকে আতশ কাচের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করলে যেমন আগুন জ্বলে ওঠে, তেমনি যোগের সাহায্যে মনকে একাগ্র করলে মনের মধ্যে অপরিসীম শক্তির জাগরণ ঘটে। এই শক্তিকে শুভপথে লাগালে আমরা জীবনে অনেক বড় কাজ করতে পারি ও সহজেই অভীষ্ট সিদ্ধ করতে পারি। যারা পড়াশুনা করে তারা নিয়মিত যোগাভ্যাস করলে মানসিক একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

স্ট্রেস: আমাদের জীবনধারার প্রতি মুহূর্তে আমরা মানসিক চাপের (stress) শিকার হই। মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেলে সব সময় অশান্তি, খিটখিটে মেজাজ, মাথাধরা প্রভৃতি দেখা দেয়। ক্রমাগত এই মানসিক চাপ থেকে হৃদরোগ, আলসার, হাঁপানী প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়। শুধু এই রোগগুলিই নয়, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে অধিকাংশ রোগেরই উৎস এই মানসিক চাপ। এই মানসিক চাপ থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পেতে মানুষ সাধারণত ধূমপান, মদ, হিরোইন, ইয়াবা প্রভৃতি মারাত্মক নেশার দিকে ঝোঁকে, আর এর ফলে ক্যানসার প্রভৃতি জটিল ও দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়ে।

এই মানসিক চাপ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় নিয়মিত যোগাভ্যাস করা। বিশ্বের খ্যাতনামা চিকিৎসাবিদেরাও এই মত পোষণ করেন।

আনন্দ লাভের প্রয়াস: মানুষ সুখ চায়, শান্তি চায় আর চায় আনন্দ। শারীরিক স্তরে মানুষ সুখ ভোগ করে, মানসিক স্তরে শান্তি আর আত্মিক স্তরে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু মানুষ এই সুখ, শান্তি বা আনন্দ মানসিক স্তরেই অনুভব করে থাকে।

সুখ: প্রতিটি জীবই সুখ চায়, প্রতিটি মানুষ সুখ চায়। কোন কিছুর অভাবই দুঃখ আর অভাবের পূর্তিই হল সুখ। জাগতিক বস্তু সীমিত আর আমাদের দেহের প্রয়োজনও সীমিত। তাই জাগতিক বস্তুর প্রাপ্তিতে সুখও সীমিত অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের মনের ক্ষুধা অনন্ত, তাই মন থেকে যায় অতৃপ্ত, শান্তি আমরা পাই না।

শান্তি: শান্তি হল মানসিক সাম্যাবস্থা। যখন আমাদের মন ব্যাষ্টিক, পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক যেমন, সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি কোন প্রকার সমস্যায় প্রভাবিত হয়, তখনই আমাদের মানসিক সাম্য বিঘ্নিত হয়, মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়, মনের শান্তি বিঘ্নিত হয়।

আনন্দ: জাগতিক বস্তুতে দেহের ক্ষুধা বা প্রয়োজন মেটে, ক্ষণিকের সুখ পাওয়া যায়। কিন্তু মনের ক্ষুধা অনন্ত বলে সীমিত সুখে মানুষের মন ভরে না। সে চায় অনন্ত সুখ। অনন্ত সুখই আনন্দ, আর আনন্দই ব্রহ্ম। মন যখন বিশেষ প্রচেষ্টায় আত্মাভিমুখী হয়ে বিস্তার লাভ করে, আত্মিক অনুভূতি লাভ করে সে পায় আনন্দ। আর তখনই কেবল আমাদের অতৃপ্ত মন তৃপ্ত হতে পারে। তাই প্রতিটি মানুষ জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক সেই আনন্দঘনসত্তা ব্রহ্মকে পেতে চায়। যোগসাধনা হল সেই বিশেষ প্রচেষ্টা, সেই আনন্দঘন সত্তাকে লাভ করার জন্য নিয়মিত শারীরিক-মানসিক-আধ্যাত্মিক প্রয়াস।

সমাজের শুদ্ধি: বর্তমানে মানুষের মনের চরম অস্থিরতা ও নীতিবোধের অভাবের প্রতিফলন সমগ্র সমাজে দেখা দিয়েছে। তাই সমাজে আজ প্রায়শ দুর্নীতি, অশান্তি ও নানা ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। গোটা সমাজটাই আজ প্রায় দুষিত হয়ে উঠেছে। আজকে এই সমাজের শুদ্ধি কেবল আইন ও প্রশাসনিক কঠোরতা দিয়ে সম্ভব নয়, তার সঙ্গে দরকার নৈতিক ও সব ধরনের সঙ্কীর্ণতামুক্ত আধ্যাত্মিক শিক্ষা। তাই চাই যোগের ব্যাপক চর্চা। বলা বাহুল্য, যোগের সঙ্গে প্রচলিত ধর্ম-জাত-পাত-সম্প্রদায়-নারী-পুরুষের কোন সম্পর্ক নেই। যোগের আদর্শ বলে, 'মানবসমাজ এক ও অবিভাজ্য', 'মানুষ মানুষ ভাই ভাই, উঁচু কিংবা নীচু নাই'।

তাই সমস্ত সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে ব্যাপক যোগচর্চার মাধ্যমে এক সর্বাঙ্গসুন্দর মানবসমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। আসুন আমরা নিয়মিত যোগাভ্যাস করে সুস্থ থাকি, শান্তিতে থাকি, আনন্দ লাভ করি আর একটা সুন্দর শোষণমুক্ত মানবসমাজ গড়ে তুলি।

প্রমিথিয়াস চৌধুরী
প্রাবন্ধিক যোগানুশীলনকারী

তর্পণ

ধারাবাহিক উপন্যাস

ঋতা বসু

পূর্ব প্রকাশির পর

দিরাং ১৪ই অক্টোবর

দুটো বড় গাড়িতে আমরা ছ'জন করে আর কাজের লোক চারজন দীপক ও ম্যানেজার বিশ্বাসের জন্য একটা মারুতি ভ্যান নিয়ে নেওয়া হল। বড় গাড়িগুলোর মাথায় আমাদের আর রান্নার যত লটবহর। বেরোবার আগে দীপক দেখি খুব হম্বিতম্বি করছে। ভাল করে মোড়াওনি আগেরবার। ডাক্তারবাবুর সুটকেশ ভিজে গিয়েছিল এবার যদি হয় তো আর রক্ষে থাকবে না।

এই প্রথম গাড়িতে করে অরুণাচলের পথে দীর্ঘ যাত্রায় চলেছি। দীপককে জিজ্ঞেস করলাম– কি ব্যাপার? মালপত্র এমন মমির মত মোড়াচ্ছে কেন?

– আপনারা হেলিকপ্টারে এসেছেন বলে জানেন না– এখানে তো দেখ না দেখ বৃষ্টি এসে যায়। আপনাদের লাগেজ এভাবে না মোড়ালে জামাকাপড় সব ভিজে গোবর হবে। তাও তো সব সময় রক্ষা পায় না। তাওয়াং আসার সময় হবি তো ডাক্তারবাবুরই সুটকেশ ভিজে গেল। সে এক মহা কেলেঙ্গারি।

মালপত্র বাঁধাছাদা করে বেরোতে বেরোতে নটা বাজল। অরিন্দম বাগচী সস্ত্রীক শায়ক ও আমরা তিনজন একটা গাড়িতে উঠলাম। বলাকা বললেন– আমাদের ধিরাং পৌঁছতে সন্ধে হয়ে যাবে। আজ কিছুই দেখা যাবে না। শুনেছি দিরাং দারুণ সুন্দর জায়গা।

অরিন্দম বললেন– এই 'সুন্দর জায়গা' ব্যাপারটা আমি বুঝতেই পারি না। আমার কাছে প্রকৃতি দুরকম। সশব্দ আর

নিঃশব্দ। নির্জন এবং জনবহুল।

আমি বললাম– বেশ বলেছেন তো। তবে নিঃশব্দ নির্জন হলেই প্রকৃতি এক ধরনের সুন্দর উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

বলাকা বললেন– অতশত বুঝি না তাওয়াংয়ের ঐতিহাসিক মূল্য থাকতে পারে কিন্তু তেমন সুন্দর ছিল কি? ছোট একটা মফস্বল টাউনের মত। সরু রাস্তা। ধুলো। মাধুরী লেকের ধারটা অবশ্য ভাল ছিল। আমরা শুনেছিলাম অরুণাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দারুণ। দেখুন রাস্তার ধারে শুধু ঘন জঙ্গল ভর্তি কলার বন। তাতে একটা কলা পর্যন্ত হয় না।

শতদল বলল এখানে কলা পাতা দিয়ে ঘর ছাওয়া হয়। খুব বৃষ্টি হয় বলে সেটাই বেশি জরুরি। কলাপাতাগুলো দেখুন কত মোটা। আমাদের বাংলাদেশের কলাপাতার মত পাতলা নয়।

প্রবীর এসব প্রাকৃতিক গল্প মোটেই মন দিয়ে শুনছিল না। সে বিষ্ণুকে ফোনে ধরবার চেষ্টা করছিল। লাইন পাচ্ছে না বলে মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে উঠেছে।

শায়কের এই যাত্রা যাত্রীদের কথোপকথন কোনকিছু ভাল লাগছে বলে মনে হয় না। বলাকা তার হাতে চাপ দিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করতেই তিনি হাত সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

পথে যশোওন্ত গড় বলে একটা জায়গায় আমাদের খিচুড়ি আলু ভাজা সিমসেদ্ধ দিয়ে গেল দীপক কাগজের প্লেটে করে।

বহুক্ষণের চেষ্টায় প্রবীর বোধহয় কলকাতায় লাইন পেল। ফোনটা নিয়ে সে অনেক দূরে চলে গেল। যদিও সে বলছে না কিছুই। শুধু শুনছে মনোযোগ দিয়ে। শতদল খাওয়া শেষ করে কাগজের রুমালে মুখ মুছে আমাকে বলল বিষ্ণু করিতকর্মা ছেলে। মনে হচ্ছে বেশ কিছু মাল মশলা যোগাড় করেছে।

দিরাংয়ে থাকার জায়গাটা দেখেই প্রাণ জুড়িয়ে গেল। মোটামুটি আধুনিক সুবিধাযুক্ত সুন্দর প্রশস্ত লনওলা একটি হোটেল। সামনে নদী জঙ্গল। দূরে পাহাড়। আমরা ঘরে ঢুকে ব্যাগ রেখে গুছিয়ে বসতেই দীপক চা আর নোনতা বিস্কুট নিয়ে হাজির। চায়ে চুমুক দিয়ে আরামের শব্দ করে প্রবীর বলল– যাই বলুন নিঃশব্দ নির্জন প্রকৃতি বেশি উপভোগ্য হয় এমন নিশ্চিন্ত আরামের বন্দোবস্ত থাকলে।

শতদল বলল– এবার শোনাও তোমার সমাচার।

প্রবীর যেন মাথার মধ্যে লিখে রেখেছিল এভাবে বলতে লাগল ডা. প্রলয় দাশগুপ্ত পাড়াপড়শির কাছে মোটেই পপুলার নন। ওর স্বভাবের জন্য আবাসনের সবাই ওকে এড়িয়ে চলে। স্ত্রী মণিকাকে নিয়ে কারও বিশেষ কোন বক্তব্য নেই। দাশগুপ্তর কথায় ওঠেন বসেন। ইদানীং ছেলেটি অল্পস্বল্প মেলামেশা শুরু করেছে। একবার দাশগুপ্তর ভুল চিকিৎসায় একজন মরমর হয়েছিল। বিরাট ঝামেলা হওয়ায় আগের পাড়া ছেড়ে সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছেন পাঁচ বছর হল। প্রতিবারই পুজোয় বেড়াতে যান। অরিন্দম বাগচী নির্বিরোধী ভাল মানুষ। একা থাকেন। ভাই ভাইপো ভাইঝি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ভালই সম্পর্ক। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন। বেণুগোপাল আয়েঙ্গার প্রায় দশ বছর রাজা বসন্ত রায় রোডের এই বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকেন। হাসিখুশি মিশুকে। মাঝে মাঝে দক্ষিণ ভারত থেকে আত্মীয়স্বজন আসে। প্রতিবার মহালয়ার পর দেশে যান ও আসেন দেওয়ালি কাটিয়ে। বন্ধুর সঙ্গে পার্টনারশিপে এ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি চালান। অবস্থা দেখে মনে হয় মোটামুটি চালু ব্যবসা। এই পর্যন্ত বলে প্রবীর আচমকা চুপ করে গেল। শতদল মনোযোগ দিয়ে শুনছিল তার কপালে গভীর ভাঁজ। বোধহয় সে যা খুঁজছে পাচ্ছে না। প্রবীরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে পর সে নাটকীয়ভাবে বলল এইবার মাল ক্যাচ। শায়ক মিত্র ও বলাকা মিত্র স্বামী-স্ত্রী নন। ভাসুর এবং ভাদ্রবউ। একই বাড়ির নিচে থাকেন তাই ঠিকানা একই। দুজনের পরিবার আছে। বলাকার পরিবার জানে তিনি স্কুলের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছেন। বরের কোন ইন্টারেস্ট নেই জানার– কোথায়। শায়কের বউ জানেন। তিনি নর্থ ইস্টের কোন অঞ্চলে অফিসের কাজে ট্যুরে গিয়েছেন। বলাকা পাবলিক বুথ থেকে ফোন করে যোগাযোগ করেছেন বাড়ির সঙ্গে। বাড়ি বলতে শয্যাশায়ী শাশুড়ি আর কাজের মাসি। শায়কের সঙ্গে মোবাইল থাকলেও স্ত্রী ফোন করেননি। কারণ লাইন পাওয়া যায় না। দরকার হলে উনিই যোগাযোগ করেন।

দীর্ঘ বিবৃতির পর প্রবীর চুপ করলে পর ঘরটা যেন হঠাৎ বড় বেশি নিস্তব্ধ হয়ে গেল। প্রবীর বলল– মলয় দত্তর সঙ্গে শায়ক মিত্রের পরিচয় থাকা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। অফিসের কাজে শায়ক সারাক্ষণই হিল্লি-দিল্লি করছে। ওদের এই গোপন অভিসার মলয় দত্ত জেনে ফেলায় তাকে সরিয়ে দেওয়া ছাড়া শায়কের আর কোন উপায় ছিল না।

শতদলের কপালে এখনও ভাঁজ। মুখে অন্যমনস্কতা। বলল– তোমার কথায় যে একেবারে যুক্তি নেই তা নয়। তবু এর মধ্যে অনেকগুলো কিন্তু আছে। শায়কের সঙ্গে মলয় দত্তর যদি আগে থেকে পরিচয় থাকেও-বা, সেটা কি পারিবারিক স্তরে? অফিসিয়ালি অনেকের সঙ্গেই অনেকের পরিচয় হয়। বউকে চেনে ক'জন? সেক্ষেত্রে শায়ক বলতেই পারতেন আমার স্ত্রী। সত্যি মিথ্যে কে যাচাই করছে?

– উনি হয়তো শায়কের স্ত্রীকে চেনেন।

– তাহলে অপর্ণা দত্তরও এদেরকে চেনার একটু সম্ভাবনা থাকে। আর যদি ধরে নিই শুধু মলয় দত্তই চিনতেন শায়ক ও তার স্ত্রীকে তাহলে অবশ্য– ভাববার কথা।

আমার ঠিক মনঃপুত হয় না। যদি ধরেও নিই শুধু মলয় দত্তই চিনতেন তিনি তো আর শায়কের বাড়ি গিয়ে তার বউয়ের কানে তুলতেন না। বড়জোর এই দলের আর কারোকে বলতেন। এই জাতীয় ডেসপ্যারেট লোকেরা এইসব গুজগুজ ফুসফুস গায়েও মাখে না। মলয় দত্তর সঙ্গে পারিবারিক স্তরে আলাপ ছিল না বোঝাই যাচ্ছে কারণ এরা অপর্ণাকে চেনেন না। প্রবীর বেশ জোর দিয়েই বলল– শতদলদা আয়াম স্পেলিং র‍্যাট। গড় গড় করে সবাই সত্যি বলবে এতটা আশা আমরা করতে পারি না। এদের মধ্যে একটা যোগ কিন্তু থাকতেই পারে।

– পারেই তো। তার জন্য এখন বার বার বিষ্ণুর শরণাপন্ন হতে হবে। তাকে বল এবার আর একটু ডিটেলে কয়েকটা খবর যোগ করতে। ডা.

ঋতা বসু। জন্ম কলকাতায়। আদি বাড়ি কুমিল্লা। পড়াশোনা শান্তিনিকেতন ও প্রেসিডেন্সি কলেজ। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা। প্রিয় বিষয় রহস্য ও ইতিহাস। ছোঁদের গল্প ও ছোঁগল্প লিখে সাহিত্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ। ক্রমশ উপন্যাসেও সমান স্বচ্ছন্দ। তাঁর সৃষ্ট পিন্টুমামা ও বাঘা এই চরিত্র দুটি তাদের রহস্যময় ও মজাদার কর্মকাণ্ডের জন্য পাঠকসমাজে প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য রচিত গোয়েন্দা শতদল একেবারে চারপাশে ঘটে চলা অপরাধ ও অপরাধীর মনস্তত্ত্ব নিয়ে পাঠককে আবিষ্ট রাখেন শেষমুহূর্ত পর্যন্ত। গল্প উপন্যাস ও রম্যরচনা নিয়ে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা সাত। ছোঁ-বড় যে-কোন ভ্রমণেই সমান উৎসাহী। চিন জাপানের প্রাচীন ক্যালকুলেশন পদ্ধতি শিখেছেন আগ্রহের সঙ্গে। লেখালেখির সঙ্গে শিশুশিক্ষা ও টিচার্স ট্রেনিংয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহু বছর ধরে। ছোঁদের এবং বড়দের দু'ধরনের লেখাতেই সমান স্বচ্ছন্দ।

চাঁদের আলোয় সাদা পাথর ছড়ানো নদী চারপাশের পাহাড়-জঙ্গলের গোপন সৌন্দর্য যেন ধীরে ধীরে আবরণ সরিয়ে আমাদের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। আমি আর শতদল সেই দম বন্ধ করা সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে কান্না মেশানো ক্ষুব্ধ নারী কণ্ঠ শোনা গেল– ইটস আ কার্স ইউ নো– উই আর কার্সড। আমরা আসলে পরস্পরকে ঘেন্না করি।

দাশগুপ্তর সেই পেশেন্ট, শায়কের অফিস ব্যাংক ডিটেল এটসেটেরা। ও– হ্যাঁ, বাকি থাকছে বেণুগোপাল আর বাগচী– এদেরও কর্মক্ষেত্র আর ব্যাংক ডিটেলটা যদি পাওয়া যায়। আপাতত এইটুকু কুটো ধরে এগোনো যাক।

আমি জানালা দিয়ে দেখছিলাম দীপক একটা সুটকেশ গাড়ি থেকে নামিয়ে দোতলায় নিয়ে যাচ্ছে। সুটকেশটার গায়ে লেখা– মি. মলয় দত্ত। কয়েক দিন আগে কত উৎসাহ নিয়ে তিনি এই সুটকেশটি গুছিয়ে ছিলেন হয়তো-বা তার স্ত্রী অপর্ণা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মনে করে করে ভরে দিয়েছিলেন। কেউ জানতেন না এমন আচমকা সেই প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। আমি শতদলের শেষ কথাটার সূত্র ধরে বললাম

– আচ্ছা তুমি এই দলটার ওপরেই এত জোর দিচ্ছ কেন? বাইরের কেউ কি করতে পারে না? আরও কয়েকটা ট্যুরিস্ট গ্রুপ এসেছে। তাদের মধ্যে কার সঙ্গে মলয় দত্তর কি ছিল সেটা জানবে কি করে?

– জানি না। শতদলে যেন বহুদূর থেকে উত্তর দিচ্ছে এইভাবে বলল– সত্যিই জানি না। তবে হাতের কাছে এরা আছে। এদেরই একটু নেড়েচেড়ে দেখি। না হলে আবার কেঁচে গণ্ডুষ করতে হবে।

রাত্রিবেলা খাবার ঘরে মণিকার পাশে অপর্ণা দত্তকে বসে থাকতে দেখলাম। মনে হল শোকের প্রথম ধাক্কাটা যেন খানিকটা কাটিয়ে উঠেছেন। আমি না চাইলেও চোখটা ঘুরেফিরে ওর দিকেই চলে যাচ্ছে। প্রত্যয়কে একটু হেসে যেন কি বলছেন।

শতদল চাপা গলায় বলল– শোকার্ত মানুষ কৌতূহলী করুণ দৃষ্টি সহ্য করতে পারে না। সিমপ্যাথির বোঝাও ভীষণ বলে মনে হয়। সব থেকে ভাল স্বাভাবিক ব্যবহার। সেদিক দিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গটা আইডিয়াল।

আমি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ সরাই। তখনই লক্ষ্য করলাম দুর্ঘটনার পর অপর্ণা আজই প্রথম সবার সঙ্গে খাবার ঘরে এসে বসেছেন বলে অন্য সবাই যেন সামান্য সতর্ক হয়ে কথা বলছে।

লম্বা সফর শেষে সবাই ক্লান্ত তাই খাবার পর যে যার নিজের ঘরের দিকে রওনা দিল। প্রবীর রুটিনমাফিক একটি দপ্তরে একটি বাড়িতে ফোন করে কম্বলের তলায় ঢুকলে পর শতদল বলল– বারান্দা থেকে দিরাংয়ের উপত্যকা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। অন্ধকারে নদী পাথর ছড়ানো দু-কুল কেমন অপার্থিব দেখায়। এমন সুযোগ বার বার আসে না। না হয় একটু পরেই ঘুমোবো। এখন চল।

ঘরের ওম ছেড়ে বারান্দায় আসামাত্রই ঠাণ্ডা হাওয়া হাত কাঁপিয়ে দিল। সামনে পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় সাদা পাথর ছড়ানো নদী চারপাশের পাহাড়-জঙ্গলের গোপন সৌন্দর্য যেন ধীরে ধীরে আবরণ সরিয়ে আমাদের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে আছে। আমি আর শতদল সেই দম বন্ধ করা সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙে কান্না মেশানো ক্ষুব্ধ নারী কণ্ঠ শোনা গেল– ইটস আ কার্স ইউ নো– উই আর কার্সড। আমরা আসলে পরস্পরকে ঘেন্না করি।

খানিকটা বাদে পুরুষ গলা বলল– আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।

– মর। তার আগে আমাকে মেরে রেখে যাও।

শতদল চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে ঘরে ফেরার ইশারা করল। আমিও আর বারান্দায় দাঁড়াতে ভরসা পেলাম না। শায়ক-বলাকার সম্পর্কের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির সাক্ষি হবার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার নেই। গোপন প্রেমের মধু ঝরে গিয়ে বিষ ফুটে উঠেছে। তিক্ত প্রেম আর অপার্থিব সৌন্দর্য পেছনে রেখে আমরা ঘরে এলাম।

প্রবীর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তাকে অল্প ঠেলা দিলাম। এভাবে ঘুম ভাঙে না কিন্তু নাক ডাকা বন্ধ হয়। আমি কম্বলের তলায় ঢোকার পরও শতদল দেখলাম চুপ করে বসে আছে। জিজ্ঞেস করাতে বলল– কি একটা ডিস্টার্ব করছে। কোথায় একটা অসঙ্গতি চোখে ধরা পড়ছে কিন্তু মন বুঝতে পারছে না–

শতদল ওইভাবে বসে আছে দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

দিরাংয়ে দ্বিতীয় দিন ১৫ অক্টোবর

পরদিন যখন ঘুম ভাঙল তখনও দেখি শতদল একইভাবে বসে আছে।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম– সারারাত ঘুমোওনি নাকি?

– খুব ভাল ঘুমিয়েছি আর ঘুমের মধ্যেই আমার প্রশ্নের উত্তরটা পেয়ে গেলাম।

– কি প্রশ্ন?

– তোমাদের বলছিলাম না - একটা অসঙ্গতি ডিস্টার্ব করছে সেইটা খুঁজে পেয়েছি।

– তাই নাকি? চটপট বলে ফেল।

– তামিল বামুনের খাওয়া আর কলকাত্তাই বচন।

আমি বললাম– এটা কি রকম গুগলি হল? উত্তরের আশা করে পেলাম এক প্যাঁচালো ধাঁধা। উত্তরটা পাব কি পাব না?

একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে শতদল বলল, এখনই পেয়ে গেলে আর ধাঁধার মজা কি? আর একটু গোলোক ধাঁধায় ঘুরি তবে না– এই সময়ে অরিন্দম আর বেণুগোপাল আমাদের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম– স্যরি, স্যরি, সবাই রেডি আমিই একমাত্র বিছানায়।

অরিন্দম বললেন– কোন তাড়া নেই শুয়েই থাকুন।

বেণু গোপাল বললেন– এরা মনে হচ্ছে দুঃসংবাদটা এখনও পাননি।

প্রবীর বাথরুম থেকে বেরোচ্ছিল। শেষ কথাটা শুনে বলল– দুঃসংবাদ শুনলেই ভয় করে। আশা করি সবাই সুস্থ আছেন।

অরিন্দম বরাভয় দান করে বললেন– বেশি মাত্রায়। আপাতত চলৎশক্তিহীন হয়ে এখানেই থাকতে হবে আরও একদিন। কাল থেকে দু'দিন আসাম বন্ধ। অতএব ফেরার পথে কাজিরাঙা দেখার যাও-বা একটা কথা হচ্ছিল সেটা পণ্ড। পরশু সোজা অরুণাচলের বর্ডার ভালুকপং। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন গৌহাটি। তারপর মন চল নিজ নিকেতনে।

দীপক ঘরের মধ্যে শুধু মুণ্ডুটি ঢুকিয়ে বলল– সবাই রেডি?

বেণুগোপাল গলায় সামান্য অনুনয় মিশিয়ে বলল– ভাই, আমাদের এখানেই দিয়ে দাও না। বেশ জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে উঠলেই ভেঙে যাবে। দীপক চলে গেলে পর সে বলল– এখন ডাইনিং হলে মিসেস দত্ত আসেন। সেটা ভালই ওর জন্য কিন্তু আমাদের মন খুলে আড্ডা দিতে একটু অসুবিধে হয়।

শতদল এই সুযোগ সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগাল। সে জিজ্ঞেস করল– আচ্ছা যেদিন মি. দত্ত মারা গেলেন সেদিন উনি যে গাড়িতে উঠলেন না এটা কারও খেয়াল হল না?

অরিন্দম বললেন– সত্যি এটা একটা রহস্য। মাত্র বারোজনের মধ্যে থেকে একজন মিসিং হয়ে গেলেন যে কি করে। এটা খুব অদ্ভুত।

এইসময় দীপক আবার কিছু একটা জিজ্ঞেস করার জন্য ঘরে ঢুকতেই শতদল আচমকা তাকে আক্রমণ করল– এই যে, দীপক তোমার না দায়িত্ব সবাইকে ঠিকঠাক দেখে রাখা। সেদিন যে মি. দত্ত গাড়িতেই উঠলেন না এটা তোমার খেয়াল হল না?

অপ্রত্যাশিত এই আক্রমণে দীপকের মুখ শুকিয়ে গেল। সে বলল– এখন এই নিয়ে কথা বলতে গেলে তো ঝগড়া করতে হয়। আমার পরিষ্কার মনে আছে আমাকে শায়কবাবু বললেন চল চল সবাই এসে গিয়েছে। পরে যখন আমি ওকে বলতে গেলাম এই নিয়ে উনি প্রায় আমাকে মারতে এলেন। বললেন আমিই যে বলেছি তার প্রমাণ আছে? এখন যদি বলি আমাকে বেণুগোপাল বলেছে বা বাগচীদা বলেছে সেটা প্রমাণ করতে পারব? তোমার দায়িত্ব তুমি পালন করনি কেন? তোমাকেই তো পুলিশে দেওয়া উচিত।

– সেই থেকে দীপকবাবু মুখে কুলুপ এঁটেছেন। বেণুগোপাল হেসে দীপককে আশ্বস্ত করে বললেন, একটু অন্যায় তোমার হয়েছে ঠিকই কিন্তু তার জন্য কেউ জেলে যায় না। তুমি যাও তোমার কাজে। কিছু হবে না।

দীপক চলে গেলে শতদল আবার সেই প্রসঙ্গেই ফিরে আসে– একটু বলবেন ঠিক কি হয়েছিল? প্রাইভেটলি বলেই বলছি। সবার সামনে তো আর জিজ্ঞেস করা যায় না।

বেণুগোপাল বলল– আমরা পরে অনেক ডিসকাস করেছি এটা নিয়ে। আসলে ষষ্ঠ লামার জন্মভিটের মধ্যে কিছু ছিল না। মেয়েরা গল্প করছিল গাড়ির মধ্যে বসে। ছেলেরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। মি. দত্ত ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলবেন বলে জঙ্গলের দিকে গেলেন। আমি প্রত্যয়কে তাসের ম্যাজিক শেখাচ্ছিলাম লামার বাড়ির বারান্দায় বসে। আমাদের সামনে দিয়েই উনি গেলেন। তারপর প্রত্যয় বলল– হিসি করবে। দু'জন দু'দিকে গেলাম।

ফিরে এসে দেখি সবাই প্রায় গাড়িতে। আমিও উঠে পড়লাম।

– কে কোন গাড়িতে ছিলেন?

– মেয়েরা এক গাড়িতেই বসেছিলেন। বাচ্চাগুলোও ওখানে ছিল। অরিন্দমদাকে অন্য গাড়িতে দেখে আমিও ওটাতেই চলে গেলাম।

– তার মানে আপনাদের গাড়িতে আপনি বিশ্বাস, দীপক, অরিন্দম, শায়ক আর ডা. দাশগুপ্ত ছিলেন।

– বিশ্বাস অন্যটাতে। আমরা অবশ্য তখনও জানতাম মি. দত্তও ওই গাড়িতে আছেন।

– আর আপনি? আপনি কোথায় ছিলেন? মি. দত্তকে লাস্ট কখন দেখেছেন? শতদল জিজ্ঞেস করল অরিন্দমকে।

অরিন্দম একটু অপ্রস্তুতভাবে বললেন– মনেই করতে পারছি না। উনি প্রায় সব সময়েই ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। তবে সেদিন আমাদের গাড়িতেই এসেছিলেন। ষষ্ঠ লামার ভিটেতে নেমেছিলেন এটুকু মনে আছে।

– আপনি কি করছিলেন?

অরিন্দমের ভুরু সামান্য কুঁচকে উঠেই সোজা হয়ে গেল। ঠাট্টার ভাব বজায় রেখেই বললেন– বাবা আপনি তো একেবারে পুলিশি জেরা শুরু করেছেন।

আমি প্রবীরের দিকে তাকালাম। এইসুযোগে আসল পরিচয়টা দিয়ে দেয়া যেত কিন্তু শতদলের আগে প্রবীরই বলে উঠল এইরকম আশ্চর্য ঘটনায় যে কোন লোকেরই কৌতূহল। মাত্র এই ক'টা লোকের মধ্যে থেকে একটা লোক উধাও হয়ে গেল কারওর খেয়াল হল না এটা একটু আশ্চর্য নয় কি?

– পরে আলোচনা করে আমাদেরও আশ্চর্য মনে হয়েছে। অথচ তখন আমরা হৈ চৈ করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। 'সবাই উঠেছে'– এ কথাটা পরস্পরকে জিজ্ঞাসাও করলাম। কেউ যে না-ও উঠতে পারে এটা তো আমাদের মাথাতেই নেই।

বেণুগোপাল বলল– পরে এত আপশোস হয়েছে। আমি যখন ওই গাড়িটার কাছে দিয়ে আসছি মনে হল মি. দত্ত পেছনের সিটেই বসে আছেন। তারপর জেনেছি বিশ্বাসদার মাথা ধরেছিল বলে একটা ওষুধ খেয়ে গাড়িতেই বসেছিলেন।

শতদল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা হোটেলের প্যাডে নানারকম সোজা আর বাঁকা লাইন টেনে দুর্বোধ্য এক ড্রয়িং করছে। যেন যে কথাগুলো শুনছে তা সংকেতে ফুটে উঠেছে তার চোখের সামনে। বেণুগোপাল আর অরিন্দমের কথায় সে যেন ভারি সন্তুষ্ট হয়েছে এমন ভাবে বলল– বেশ তারপর আপনারা ওয়ার মেমেরিয়ালে এলেন। সেখানে এসেও আপনাদের মনে হল না?

অরিন্দম এবার যেন একটু বিরক্ত – দেখুন আমরাও বেড়াতে এসেছি। আমাদের কি এটাই কাজ সারাক্ষণ কে কোথায় গেলেন তার খোঁজ রাখা?

বেণুগোপাল জুড়ে দিল– এখন চলে গেছেন বলা উচিত নয় তবু আমাদের ওপর এত ব্লেম দেওয়া হচ্ছে বলে বলছি উনি অত পপুলারও ছিলেন না যে সারাক্ষণ ওকে আমরা মিস করব।

এর মধ্যে দীপক আমাদের ঘরে লুচি তরকারি মিষ্টি প্লেটে করে দিয়ে গিয়েছে। খেতে খেতেই কথা হচ্ছিল। শতদল বেণুগোপাল আর অরিন্দমের অসন্তোষ দেখে তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে হেসে বলল– যাক যা হবার হয়েছে। এখন আর কিছু মিস না হয়– তার ব্যবস্থা কতদূর চলুন দেখি গিয়ে।

বাইরে এসে দেখি সবাই রেডি। সকালের ঝলমলে রোদে দিরাংয়ের রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এতক্ষণে অরুণাচলে যেন ঘোমটা পুরোটা সরিয়ে তার চাঁদবদনটি আমাদের দেখাল। বিশ্বাস বলল– এখানে নদীর ধারটা খুব সুন্দর। ওখানে আগে চলুন ফেরার পথে একটা এ্যাপেল অর্চাডে নামব।

বেণুগোপাল পায়ের জন্য আর বেশি না হেঁটে বসে রইল একটা কালভার্টের ওপর। তার ক্ষুদে ভক্ত প্রত্যয়ও রয়ে গেল তার সঙ্গে। আমরা বেরিয়ে ফিরে দেখলাম প্রত্যয় হাঁ করে বেণুগোপালের গল্প শুনছে। সাঙ্ঘাতিক মরণপণ লড়াইয়ের গল্প। জবরদস্ত শত্রুসৈন্যদের সামনে বীর সেনানীদের অসম সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণের গল্প। পাঁচ দশ মিনিট গল্পটা শোনার পর শায়ক বলল– কেন মিথ্যে এই সব গল্প শোনাচ্ছেন? আজকের আর্মির কাছে আপনি কি কোন দেশপ্রেম সত্যিই আশা করেন? একগাদা সুবিধে পাওয়া টোটালি কোরাপ্ট একটা ডিপার্টমেন্ট।

বেণুগোপালের চোখ জ্বলে উঠল বাঘের মত– অন্তত আমার আপনার থেকে তাদের দেশপ্রেম যে বেশি আছে এটা বিশ্বাস করি। চল প্রত্যয় বাকি গল্প পরে হবে।

শায়ক এতটা রুক্ষতা আশা করেনি। সে স্পষ্টতই বিস্মিত। খুব তাড়াতাড়ি অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে আমাদের সমর্থন আছে এইভাবে বলল– প্রত্যয়ের আর ওঁর ম্যাচিওরিটি লেভেল যে এক তা তো জানতাম না।

ভাগ্যিস ততক্ষণে বেণুগোপাল গাড়িতে উঠে গিয়েছিলেন নয়তো এবার হাতাহাতি অবশ্যম্ভাবী ছিল।

• আগামী সংখ্যায়

ঋতা বসু ভারতীয় কথাসাহিত্যিক

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের জন্য ভারত সরকারের স্কলারশিপসমূহ

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারত ও বাংলাদেশে পড়ালেখার জন্য বিভিন্ন স্কিমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বিপুলসংখ্যক স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে। এগুলি নিম্নরূপ:

১. আইসিসিআর স্কলারশিপসমূহ

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স (আইসিসিআর) ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কোর্স গ্রহণে নিম্নোক্ত স্কলারশিপসমূহ প্রদান করে:

ক. ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম;
খ. বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম;
গ. সার্ক স্কলারশিপ স্কিম;
ঘ. কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম; এবং
ঙ. আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম।

ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম

যুব বিশেষত বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষার্থী বিনিময় বৃদ্ধির ভারতীয় প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং ২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকা সফরকালে মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়া স্কলারশিপ স্কিম ঘোষণা করেন। সেই সূত্রে আইসিসিআর ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে স্কিমটি প্রবর্তন করে। এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীরা মানবিক, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/পিএইচ ডি কোর্স (ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিসিন ছাড়া)-এ ভারতে অধ্যয়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর প্রতি বছর প্রকৌশল, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ব্যবস্থাপনা, ফার্মাসি, চারুকলা ও চিরায়ত ভারতীয় ভাষাসমূহ অধ্যয়নে স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) শিক্ষার্থীদের স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

সার্ক স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ এম ফিল/ পিএইচডি (মেডিসিন ছাড়া) কোর্সে স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ স্কিম

এ স্কিমের আওতায় আইসিসিআর স্নাতক/স্নাতকোত্তর/এম ফিল/পিএইচ ডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে (মেডিসিন ছাড়া) স্কলারশিপ প্রদান করে থাকে।

উপরোক্ত ক-ঘ স্কিমগুলির জন্য সাধারণত ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দানের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা আরো তথ্যের জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট ভিজিট করতে পারেন: www.hcidhaka.gov.in

আয়ুশ স্কলারশিপ স্কিম

প্রতি বছর ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ভারতের ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থা যেমন আয়ুর্বেদ, ইউনানি, সিদ্ধ ও হোমিওপ্যাথি কোর্সে অধ্যয়নের জন্য আইসিসিআর-এর এ কোর্সের জন্য স্কলারশিপ নির্বাচন সমন্বয় করে থাকে। স্কিমটি সাধারণত জুলাই মাসে ঘোষণা করা হয়।

ভারতীয় শিক্ষাবৃত্তি ২০১৭-১৮

আবেদনকারীদের বিপুল সাড়া এবং আগ্রহের প্রেক্ষিতে ভারতীয় হাই কমিশন আইসিসিআর শিক্ষা বৃত্তি ২০১৭-২০১৮-এর আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ থেকে ০৩ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়।

শিক্ষাবৃত্তির জন্য বিস্তারিত তথ্য/দিক নির্দেশনাসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার এই লিঙ্ক http://www.hcidhaka.gov.in/pages.php?id=19741-এ দেওয়া হয়েছিল। প্রার্থীকে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন পত্র ডাউনলোড এবং পূরণ (টাইপ করা হতে হবে, হাতে লেখা গ্রহণযোগ্য নয়) করতে বলা হয়েছিল। আবেদনপত্রে ছবি স্ক্যান করে সংযুক্ত করে এবং স্বাক্ষর (হাতে লিখে স্ক্যানকৃত স্বাক্ষর) ও তথ্যাদিসহ আবেদনপত্রটি পিডিএফ ফরম্যাটে তৈরি করে প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ নিচে উল্লেখিত যে কোন ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা পরিমাপের জন্য এবং পরবর্তীতে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষার করার জন্য ই- মেইল করতে বলা হয়:

ক. ভারতীয় হাই কমিশন,ঢাকা: attedu@hcidhaka.gov.in
খ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, চট্টগ্রাম: ahc@colbd.net
গ. সহকারী ভারতীয় হাই কমিশন, রাজশাহী: ahc.rajshahi@mea.gov.in

যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা পরীক্ষা (ইপিটি) অনুষ্ঠিত হয় ১৩ জানুয়ারি ২০১৭।

এবছর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে রেকর্ডসংখ্যক ১৭২১ জন শিক্ষার্থী ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেসন্স-এর আইসিসিআর স্কলারশিপ ২০১৭-র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। আবেদনের জন্য বিজ্ঞপ্তি, আবেদনের শেষ সময়, যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা ইত্যাদি ফেসবুকের এই পেজসহ বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হয়।

• বিজ্ঞপ্তি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা লালনের একমাত্র ছবি

প্রবন্ধ

খুলবে কেনে সে ধন ও তার গাহেক বিনে

মিলন সরকার

লালন বিষয়ে আমাদের সামান্য পঠন-পাঠনে মনে হয়েছে যে, প্রায় সবাই লালনকে বাইরে থেকে দেখেছেন। আমাদের মনে হয় তাঁকে ভেতর থেকে দেখা দরকার। লালনবীক্ষণের আমাদের এই প্রস্তাবনার সীমাবদ্ধতাকে সহৃদয় পাঠক সহজভাবে নেবেন আশা করি।

১৯১৫ সালে *প্রবাসী*তে মুদ্রিত লালনের এ গান আজ আমাদের এ লেখার শিরোনাম। এ গানে লালন বলেছেন যে, উপযুক্ত গায়ক ছাড়া গান রসোত্তীর্ণ হয় না অর্থাৎ যে বোঝে কেবল তার কাছেই কথার মানে ধরা দেয়।

১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর লালনের মৃত্যুর ১৪ দিন পর ৩১ অক্টোবর *হিতকরী* পত্রিকা ছেঁউড়িয়ায় লালন শিষ্য শীতল প্রমুখের যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিল তাতে জানা যায় যে, তিনি কায়স্থ, চাপড়ার ভৌমিকেরা তাঁর জ্ঞাতি, তীর্থে যাবার পথে বসন্তে আক্রান্ত ও পরিত্যক্ত হয়ে এক মুসলমানের ঘরে সেবা এবং ঐ বাড়ির অতিথি ফকির সিরাজ সাঁইয়ের কবিরাজি চিকিৎসা পান। সম্ভবত তাঁর কাছে কিছু তত্ত্বকথা ও বাউল গানও লালন শুনে থাকবেন। তিনি খুব ধার্মিক, সংসারী, তাঁর বাউল জীবনের স্ত্রী ও ধর্মকন্যা এবং কিছু স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ছিল, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১৬ বছর ইত্যাদি এবং সেই সঙ্গে লালনের

আমরা লালন বিশেষজ্ঞ নই, লালন জীবনীতো নয়-ই, এমনকি তাঁর গানের বিশ্লেষণের অধিকারীও নই। আমরা শুধু তাঁর গানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে লালনকে চিনে নেবার চেষ্টা করব। লালনের গানেরও নেপথ্য কাহিনি আছে, তাঁর গানের লক্ষ্যও আছে নিশ্চয়ই। আপাতত এতদিনে অন্তত এইটুকু বোঝা গেছে যে, এ এলাকায় লালন নামে অনেক আগে একজন প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন।

একটি গান 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে' ছাপা হয়েছিল। লালনের গানের ভনিতায় নালন তথা লালন নামটি লালনের পরিবারপ্রদত্ত না তাঁর বাউল জীবনে গৃহীত তা জানা যায় না।

১৮৭২ সালে কাঙাল হরিনাথের *গ্রামবার্তা প্রকাশিকায়* লালনের নাম প্রথম জানা যায়। অনুমান করা যায় যে, বছর তিরিশেক বয়সের দিকে অর্থাৎ অনুমান ১৮০০ সালের দিকে তিনি মুসলমানগৃহে অন্নজলগ্রহণের অপরাধে রক্ষণশীল সমাজ-পরিত্যক্ত হয়ে ঘর ছেড়েছিলেন এবং তাঁর নাম পরিচিত হয়ে উঠতে অন্তত বছর তিরিশেক অর্থাৎ অনুমান ১৮৩০ পর্যন্ত সময় লেগেছিল। মাঝখানের ৩৮ বছর সম্ভবত গুরুর আশ্রয়ে এবং ভ্রাম্যমাণ জীবন কাটিয়েছেন তিনি। সেই ১৮৭২ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকে লালনের কথা লিখে চলেছেন। তার ৮ বছর পর ১৮৮০-তে কাঙালকুটিরে লালনের গানের (আমি একদিনও না দেখিলাম তারে) প্রথম আসর বসবার কথা জানা যায়, ১৮৮৫ সালে কাঙালের *ব্রহ্মাণ্ডবেদে* তাঁর গান (কে বোঝে সাঁইয়ের লীলাখেলা) প্রথম ছাপা হয়। আবার মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৮৯-এ শিলাইদহে বোটের ওপর জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে তিনি গান শোনাতে গিয়েছিলেন বলে জানা যায়। সেই ১৮৮৫ থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর গান নিয়ে কাজ হচ্ছে, লেখা হয়েছে অনেক ব্যাখ্যা। ইদানীং তাঁর গানের মর্মোদ্ধারে শব্দভেদী এমনকি শব্দবেধী ভাষ্যও রচিত হচ্ছে। তাঁর গানের ধরন-ধারণ নিরিখ যাচাই করে তার আবার নানান ভাগও করা হচ্ছে, শব্দের ব্যবচ্ছেদও হচ্ছে। কিন্তু তাঁর গানের কাল অর্থাৎ কোন গান আগে, কোন গান পরে রচিত, একথা ঠিক করে বলা মুশকিল।

বাংলার ভয়ংকর প্রাণঘাতী মন্বন্তর হয়েছিল ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের ১২ বছর পর ১৭৬৯ সালে, তার ৫ বছর পর ১৭৭৪ সালে লালনের জন্ম। তখন বাংলার দুর্দিন– খরা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, সীমাহীন দারিদ্র্য ও বেকারত্বের মুখোমুখি হয়েছিলেন লালন। লালনের বয়স যখন ১৯, সেই ১৭৯৩ সালে যখন লুণ্ঠনসর্বস্ব ইংরেজ কোম্পানির শাসন নতুন জমিদারি প্রথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করল তখন জমিদারতন্ত্রের নিষ্ঠুরতা এবং তার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের চরম অমানবিকতা মানুষের নাভিশ্বাস ডেকে এনেছিল। তাঁর বয়স যখন ১৮ তখন গঞ্জশহর কুমারখালীতে বস্ত্র কারখানা গড়ে উঠছে, সেখানে ১৭৯২ সালে এক রেশম কুঠিতে দাবি আদায়ের লক্ষে শ্রমিক বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সেপাইরা গাদা বন্দুক ব্যবহার করছে। দরিদ্র সংসারের নিরক্ষর, না-খাওয়া, দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া মানুষ লালন, ঘরে বিধবা মা ও বধূ, তিনি তো কুমারখালীর কোন এক কুঠিতে যোগ দিতে পারতেন জীবিকার অন্বেষণে। সম্ভবত উদাসীন প্রকৃতির এ কিশোরকে ঘরে বাঁধবার জন্য অভাবী বিধবা মা বেকার অল্প বয়সী লালনের বিয়ে দিয়েছিলেন, তবুও ঘর লালনকে ধরে রাখতে পারেনি। নদীয়ার চৈতন্য ভাবাশ্রিত নিম্নবঙ্গের এক গণ্ডগ্রামের কিশোরের মনে জেগেছিল বৈরাগ্য ভাবাবেগ, তাছাড়া গ্রামের সাধু-বোষ্টমদের সঙ্গেও হয়তো তার ওঠাবসা ছিল। এ সবই লালনের উদাসীন মানসিকতা গঠনে ভূমিকা রেখেছিল, যৌবনে ঘরে কিশোরী বধূ রেখে তাঁর তীর্থযাত্রাও এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

হিতকরীর উল্লেখে জানা যায় যে, তাঁর জন্ম হিন্দু ঘরে। শাস্ত্র তাড়ানো, সমাজ খেদানো লালন মুসলমান ফকির ঝিনাইদহের হরিশপুরের সিরাজ সাঁইয়ের শিষ্যত্ব নিয়ে তাঁর পূর্বজ্ঞাত হিন্দুঐতিহ্য ও সিরাজসান্নিধ্যহেতু এবং মুসলমান স্ত্রী ঝিনাইদহের হরিশপুরের জমির খোনকারের কন্যা বিসখা বিবির সাহচর্যহেতু তিনি মুসলমানঐতিহ্য সহযোগে এক যুগলবন্দী ঐতিহ্যের গান বেঁধেছিলেন। তাঁর গানের উৎস যাই হোক না কেন তিনি না-হিন্দু, না-মুসলমান, তিনি নাড়ার ফকির। তবে তাঁর গানের মূল প্রবাহ হচ্ছে অসত্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ। প্রশ্ন উঠতে পারে তাঁর গানের সংখ্যা কত? ১৮৮৫-১৯১৭ পর্যন্ত ৩২ বছরে পুনর্মুদ্রণসহ তাঁর গান সংখ্যা ৪৯টি। ১৯০৭-১২ সময়কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের যে ৩টি নকলী খাতা সংগ্রহ করেন তার গান সংখ্যা পুনরাবৃত্তি বাদে ৪২৯। এসব গান তাঁর সাক্ষর শিষ্যরা লিখে রাখতেন, তিনি নিজে সাক্ষর ছিলেন কিনা জানা যায় না।

আমরা লালন বিশেষজ্ঞ নই, লালন জীবনীতো নয়-ই, এমনকি তাঁর গানের বিশ্লেষণের অধিকারীও নই। আমরা শুধু তাঁর গানের মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, তার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে লালনকে চিনে নেবার চেষ্টা করব।

লালনের গানেরও নেপথ্য কাহিনি আছে, তাঁর গানের লক্ষ্যও আছে নিশ্চয়ই। আপাতত এতদিনে অন্তত এইটুকু বোঝা গেছে যে, এ এলাকায় লালন নামে অনেক আগে একজন প্রতিবাদী মানুষ ছিলেন। তাঁকেই লোকে বলে থাকে বাউল ফকির লালন সাঁই। এখন প্রশ্ন এসে যায় বাউল কে? প্রতিবাদ কিসের?

জীবন-জীবিকার অভাবে অধিকারবঞ্চনার শিকারে পরিণত তৃণমূল মানুষ যখন অসহায় হয়ে পড়ে তখন তার মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে, তার মধ্যে এক ধরনের বিবাগী মনোভাব গড়ে উঠতে পারে, অথবা সে উৎকণ্ঠায় উন্মাদ হয়ে যেতে পারে, হতে পারে উচ্ছৃঙ্খল অথবা আত্মঘাতী আবার উন্মুল– এ অবস্থায় সে হয়ে উঠতে পারে প্রতিবাদী। সে প্রতিবাদ হতে পারে প্রচণ্ড, আক্রমণাত্মক অথবা তার নিঃস্বতার, রিক্ততার প্রতিকারের বহিঃপ্রকাশ হতে পারে আপসহীন বেদনার গানে। মর্মের সেই বেদনাঘন গানই মরমী গান। আর এর রচয়িতা ও গায়ক সেই সব হারানো সব খোয়ানো মানুষ, যাকে আমরা বলে থাকি খ্যাপা, পাগলা বা বাউল। এককালে আমাদেরই হঠকারিতায় লালন ঘর ছেড়ে ছিন্নমূল হতে বাধ্য হয়েছিলেন, সম্ভাবনাময় তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতা থেকে তিনি বঞ্চিত। কালের কি পরিহাস, এতকাল পরেও আজও সেই ছিন্নমূলের গানই আমাদের দৃঢ়মূল হতে শেখাচ্ছে।

এবার ঐ প্রতিবাদের কথা। বাউলরাতো ইহবাদী, তাঁদের মধ্যে পারমার্থিকতা থাকার কথা নয়। দুর্লভ এই জীবনেই তাঁদের সব পেয়েছির শেষ। তাঁরা বাধ্য হয়েই প্রচলিত সমাজ বহির্ভূত, অথচ তবুও কেন তাঁদের গান আমাদের প্রচলিত সমাজে সমাদৃত? তা কি কেবলই আমাদের মনোরঞ্জনের হুজুগে, না কোন বাস্তবিক প্রয়োজনে? তাঁদের গান ইঙ্গিতময়, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁরা একটা কথাই বার বার বলতে চেয়েছেন, তাঁরা কেন আজ সমাজছুট আর আমরা কোন ঝুটা সত্যের পেছনে ছুটছি।

জাতপাত প্রথা তো কায়েমী স্বার্থবাদীদের সমাজকে শ্রেণিবিভক্ত করে শ্রেণিশোষণকে বলবৎ রাখার কৌশল। জাতপাতের বালাই বাদ দিয়ে, ধলা-কালার ভেদ তুলে দিয়ে, নারী-পুরুষের ভাগাভাগি না এনে, ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার ভেদবুদ্ধি ভুলে গিয়ে সকলে মিলে মিশে দুর্লভ ও সংক্ষিপ্ত এ জীবনে সমতার ভিত্তিতে উপভোগের সুযোগ সৃষ্টিতে আমাদের যে অপদার্থতা ও ব্যর্থতা তারই বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ।

আমরা বলে থাকি মানুষের শেকড়ের খবর আছে লোকসংস্কৃতির ভেতরে। বাউল গান ঐ লোকসংস্কৃতির জোরালো উপাদান। গানই সংস্কৃতির সহজ মাধ্যম যা মানুষকে জাগাতে শতভাগ সক্ষম। সুতরাং বাউল গান, মানবতার গান, সর্বহারা মানুষের গান, আমজনতার জাগরণের গান। এ গান প্রেরণা দেয় সব ভেদ ভুলে গিয়ে, আর্থ-সামাজিক সমতা এনে সকলে মিলে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে

অন্তত সহনশীল এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

খেটে খাওয়া মানুষের উদ্বৃত্ত শ্রমের পাহাড় জমানো পিরামিডের শিখরচারী ঐ আধিপত্যবাদী কি করে পিরামিডের তলদেশের সেই অধিকারবঞ্চিত মানুষের বেদনা বুঝবে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রান্তিকজনের ধর্ম ছিল তখন দারিদ্র্যধর্ম। সামন্ত অর্থনীতির শিকারে পর্যুদস্ত, দুরবস্থার কার্যকারণ নির্ণয়ে অজ্ঞতাহেতু অসহায়ত্বের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে এসব গানে। 'জাত' অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত সমাজের যে অবান্তর বিভেদমূলক ব্যবস্থা, মানুষের ধর্ম পরিচয়ের যে ভেদরেখা অথবা নারী পুরুষের যে লিঙ্গবৈষম্য এ তো মানুষকে বিভক্ত করার অপকৌশল এবং একে কেন্দ্র করে শ্রেষ্ঠতা এবং হীনতার প্রভেদ তো আসলে সেই 'ভাগ কর শাসন কর' বিভাজনী কূটকৌশল। 'সবার ওপরে মানুষ সত্য' এই ব্রত নিয়ে এক কাতারে সামিল হবার আহ্বান এসব গান।

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে লালন জীবনবাদী নন কেন-না সমাজ পরিত্যক্ত হয়ে তো তিনি শ্রম বিক্রি করে নতুন করে ঘর বাঁধতে পারতেন। লালন মাঠে চোর মঠে সন্ন্যাসী ছিলেন না। মুখে এক আর জীবনে অন্য বা সুবিধাবাদী অর্থাৎ অন্তত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের সেবাদাস ছিলেন না তিনি। অষ্টাদশ শতকের সত্তর দশকে দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামদেশে তখন বৈষ্ণবীয় বৈরাগ্য ভাবাবেগ প্রবল এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর গুরুর সুফি মতাদর্শের 'মানুষে মানুষে ভাই ভাই' তত্ত্ব। এসব আবেগ এবং অর্থনৈতিকভাবে থতমত নিম্নবিত্তের মানুষের যে মনস্তত্ত্ব গড়ে তুলেছিল তাতে তিনি যে জাতপাতহীনতার অশ্রেণিক একটি বাতাবরণ তৈরি করেছিলেন তার একটি সামাজিক ইতিবাচকতা ছিল। অন্ততপক্ষে তিনি প্রথাগত সাধক হয়ে মতলববাজ সমাজের সঙ্গে সমঝোতা করেননি।

সেকালে যখন আদিম সাম্যবাদী সমাজের পড়তিদশা, প্রভুত্বকামী রাজকীয় সমাজের উঠতিপর্ব, তখন সামাজিক অনিশ্চয়তার মুখে এসেছিলেন সংঘবার্তা নিয়ে মানবমৈত্রীর অগ্রদূত গৌতম বুদ্ধ, আমাদের সাংস্কৃতিক মধ্যযুগে যখন শাস্ত্রীয় জটিলতা, অর্থনৈতিক অবক্ষয় চরমে তখন এলেন ভক্তিধর্মের সন্তকবিরা– দাদু, কবীর, রজ্জবেরা, তাঁরাও মিলনের বার্তা নিয়ে এলেন, ষোড়শ শতকে আবার অবক্ষয়, অনিশ্চয়তা এবং বহিরাগত অভিঘাত এসে হানা দিলে এলেন নদীয়ার নিমাইচৈতন্য সেই একই জাতপাতহীন সর্বমানবীয় বার্তা নিয়ে, এভাবে বারবার ভাববিপ্লবীরা চেষ্টা করেছেন সব মানুষের মহাসম্মেলনে এক মানবসমাজ গড়ে তুলতে। কালের করালগ্রাসে ক্ষীয়মাণ সেই ধারাতেই মহামিলনের বরপুত্র লালন নতুন স্রোতোবেগ নিয়ে এলেন 'মনের মানুষের' বার্তায়। ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এভাবে বারে বারে শুভবার্তা নিয়ে এসেছেন সমাজহিতৈষীরা অভিন্ন এক মানবমঞ্চ গড়তে।

বলা হয়ে থাকে যে, গানই নাকি এঁদের ভৌত জীবনের বাণী। তাঁদের আসন আসব ও আসঙ্গ একত্রে লালনদর্শনের একটি স্থূল চিত্র মাত্র। লালন তো অন্তত ভানকারী ছিলেন না, তাঁর দর্শনের আরেক পিঠে তো আছে তাঁর গানের যে জোর ও ঝোঁক– যা দ্রোহ এবং মানবতার সপক্ষে মানবতার বিরোধের বিপক্ষে লড়াই, লালনদর্শনের এই যোগ্যতাটুকু মনে হয় বেঠিক নয়। আজকের দেউলিয়া সমাজে যেখানে মানুষ মানবিক বিপর্যয়ের মুখে সেখানে লালনের গান সেই আপনার খবরের গান।

প্রশ্ন উঠতে পারে লালন কি সচেতনভাবে তাঁর এসব গান বেঁধেছিলেন? আমাদের উত্তর, নিশ্চয়ই তাই। আমাদের মত দূর থেকে নয়, খুব কাছ থেকে লালন মুষ্টিমেয় মানুষের তৈরি নিগড়ে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিগ্রহকে দেখেছিলেন, তাছাড়া তিনি নিজেও সামাজিক অবিচারের সাক্ষাৎ শিকার হয়েছিলেন। শ্রেণিবিভক্ত শোষণভিত্তিক সমাজ সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন, বিশেষ করে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদের অমানবিকতা তাঁকে ব্যথিত ও বিক্ষুব্ধ করেছিল, তিনি হয়ে উঠেছিলেন দ্রোহী। যেহেতু তিনি স্বাধীনচেতা প্রতিবাদী মানুষ এবং যেহেতু তিনি সশস্ত্র লড়াকু নন, সেহেতু এসব আর্থ-সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন তিনি, বেছে নিয়েছিলেন লোকায়ত সুরের গান, তাঁর ভাষাকে নিরাপত্তার কারণে করেছিলেন কৌশলগত আর এভাবেই গানের মাধ্যমে মানবাধিকার বঞ্চিত মেহনতি মানুষের ইজ্জত আদায়ের আহ্বান জানিয়ে গেছেন তিনি। নগরবাসী বর্ণ বা শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সুবাধাবাদী গোষ্ঠীর সমাজসংস্কারের আন্দোলন নয়, হীনস্থানিক জাতপাতহীন গণমানুষের কল্যাণব্রতী তৃণমূল পর্যায়ের আন্দোলনের কথাই তিনি বলেছেন তাঁর গানে।

লালনের গানের এই আহ্বানের দিক, প্রেরণার দিক এবং গণজাগরণের এই দিকটি অনুধাবন না করে আমরা কেবলই মনোরঞ্জনের বা অবসর বিনোদনের প্রায়োগিক দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়ে চলেছি। লালনের গানের যে বার্তা শ্রোতার পক্ষে তার অন্তর্ভেদের অক্ষমতা বা করুণ উপেক্ষাই হয়তো এর অন্যতম কারণ। তিনি তো জটিল অর্থনীতির ভেদাভেদের শিকার নিরুপায় ও জীবিকার অভাবে বিব্রত আমজনতার অস্তিত্ব-বিরহের কথাই বলেছেন।

আজকের যে বিশ্বব্যবস্থা তাতে লালনের গান কতটুকু ইতিবাচক তা বিশেষজ্ঞজন তলিয়ে দেখবেন। তবে লালনের গান শুধু বিনোদন সামগ্রী নয়, নয় শুধু মধ্যবিত্ত বাঙালি ভদ্রলোকের উপলক্ষের সংস্কৃতি। গানের ভেতর দিয়ে তাঁর স্বপ্নকে বোঝা এবং তা বাস্তবায়নের কাজটি করা হচ্ছে না। লালনের এই গানগুলোর যারা ধারক-বাহক অর্থাৎ ঘরছাড়া সেই বাউলদের পুনর্বাসনের কাজটিকে আমরা ভুলে গেছি, তাদের প্রান্তবাসী না রেখে, পরান্নজীবী না করে, দেহতত্ত্বের হেঁয়ালিপনা থেকে সরিয়ে এনে, শিক্ষা সাম্য প্রগতিমুখী মানুষের কাতারে সামিল করে দুর্লভ ও সংক্ষিপ্তকালের এ সম্ভাবনাপূর্ণ মানবজীবনের পরিপূর্ণতার নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টি করে দেবার অঙ্গীকার আজ আমাদের করতে হবে।

মিলন সরকার
প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

এক নজরে সিকিম

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	গ্যাংটক
জেলা	৪টি
প্রতিষ্ঠা	১৬ মে ১৯৭৫
সরকার	
• শাসকবর্গ	সিকিম সরকার
• রাজ্যপাল	শ্রীনিবাস দাদাসাহেব পাটিল
• মুখ্যমন্ত্রী	পবন চামলিং (এসডিএফ)
• আইনসভা	এককক্ষবিশিষ্ট (৩২টি আসন)
• হাইকোর্ট	সিকিম হাইকোর্ট (ইটানগর শাখা)
আয়তন	
• মোট	৭,০৯৬ বর্গকিমি (২,৭৪০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	ঊনত্রিশতম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৬,৪৪,৬৬০
• ক্রম	ঊনত্রিশতম
• ঘনত্ব	৯১/বর্গকিমি (২৪০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-SK
সরকারি ভাষা	নেপালি, ইংরেজি
ওয়েবসাইট	sikkim.gov.in

শ্রীনিবাস দাদাসাহেব পাটিল

পবন চামলিং

রাজ্য পরিচিতি

সিকিম

সিকিম ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য। এর উত্তর ও পূর্বে চিন, পূর্বে ভূটান, পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। সিকিম বাংলাদেশের নিকটবর্তী শিলিগুড়ি করিডোরের কাছে অবস্থিত। পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয়ের অংশ সিকিম আলপাইন ও উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় জলবায়ু এবং ভারতের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ কাঞ্চনজংঘাসহ এর জীববৈচিত্র্যের জন্য বিখ্যাত। সিকিমের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর গ্যাংটক। রাজ্যের প্রায় ৩৫ শতাংশ জুড়ে আছে কাঞ্চনজংঘা জাতীয় উদ্যান।

সপ্তদশ শতাব্দীতে নামগিয়াল রাজবংশ সিল্ক রোডের ধারে সিকিম রাজ্যের পত্তন করেন। চোগিয়াল নামে পরিচিত বৌদ্ধ পুরোহিত রাজা ছিলেন এর শাসক। একদা কিয়িং চিনের সামন্ত রাজ্যটি ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ ভারতের ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হয়। গণচিনের তিব্বত দখলের পর সিকিম ব্রিটেন এবং ভারত প্রজাতন্ত্রে সংরক্ষণমূলক মর্যাদা পেয়ে আসছিল। হিমালয়ের রাজ্যগুলির মধ্যে সাক্ষরতার হার ও মাথাপিছু আয়ে সিকিম সর্বোচ্চ। ১৯৭৫ সালে সিকিমে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয় এবং এক গণভোটের মাধ্যমে এটি ভারতের ২২তম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

আধুনিক সিকিম একটি বহুজাতি ও বহুভাষী ভারতীয় রাজ্য। সিকিমে ১১টি সরকারি ভাষা: নেপালি, সিকিমিজ, লেপচা, তামাং, লিমবু, নিউয়ারি, রাই, গুরুং,

গ্যাংটকের দ্রো-দুল চোরতে স্তূপ

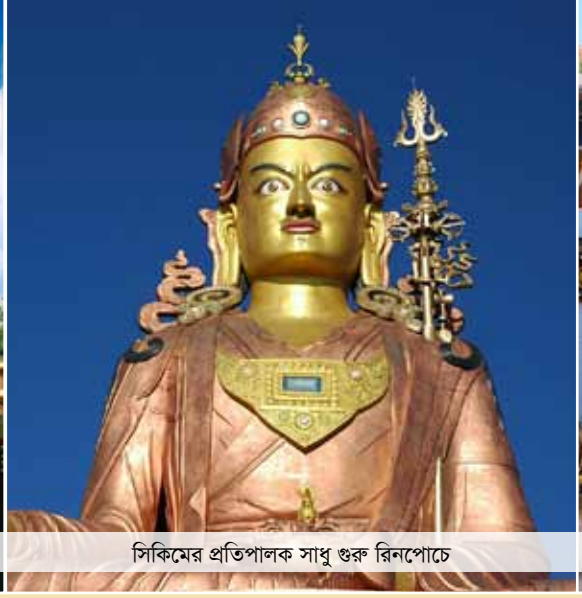
সিকিমের প্রতিপালক সাধু গুরু রিনপোচে

লোসার উৎসবে ঐতিহ্যবাহী গুম্‌ফা নাচ

মগর, সুনওয়ার ও ইংরেজি। স্কুলে ইংরেজি পড়ানো হয় এবং সরকারি দলিল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুধর্ম ও বজ্রযান বৌদ্ধধর্ম এখানকার দুই প্রধান ধর্ম। সিকিমের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি ও পর্যটননির্ভর। ২০১৪ সালের হিসেব অনুযায়ী, ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে সিকিমের জিডিপি ৩য় ক্ষুদ্রতম, যদিও এর প্রবৃদ্ধি সবার চেয়ে দ্রুততম।

সিকিমে ভারতের সর্বোচ্চ এলাচ উৎপাদিত হয়। সিকিমের কৃষি জমির একটি বড় অংশ অরগ্যানিক ফার্মিংয়ে ব্যবহৃত হয়। এটি ভারতের সবচেয়ে পরিবেশসচেতন রাজ্য, এখানে প্লাস্টিকের জুসের বোতল ও স্টাইরোফোম উৎপাদন নিষিদ্ধ।

সিকিম নামটি দুটি লিমবু শব্দ *সু* (নতুন) ও *কাইম* (প্রাসাদ বা ভবন)-এর সম্মিলিত রূপ। রাজ্যের প্রথম শাসক ফুন্‌সগ নামগিয়াল নির্মিত প্রাসাদের উল্লেখ থেকে নামটি গৃহীত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। সিকিমের তিব্বতী নাম *দ্রেনজং* যার মানে হচ্ছে 'ধানের উপত্যকা'। অন্যদিকে ভুটিয়ারা একে বলে *বেয়ুল ডেমাজং*, যার অর্থ হচ্ছে 'ধানের গোপন উপত্যকা'। সিকিমের মূল বাসিন্দা লেপচা জনগণ একে বলেন *নিয়ে-মায়ে-এল* অর্থাৎ 'স্বর্গ'। ইতিহাসে সিকিম *ইন্দ্রকিল* নামে পরিচিত, যার মানে হচ্ছে 'ইন্দ্রের বাগান'। ইন্দ্র হিন্দু পুরাণের যুদ্ধ দেবতা।

ইতিহাস

রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা: এর আদি বাসিন্দা লেপচা, এছাড়া সিকিমের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে সামান্যই জানা যায়। ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মগুরু পদ্মসম্ভবের (*গুরু রিনপোচে* নামেও সমধিক পরিচিত) একটি উদ্ধৃতিতে সিকিমের সবচেয়ে পুরনো ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। গুরু বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মাধ্যমে এই ভূমিকে আশীর্বাদ করেছেন। এর কয়েক শতাব্দী পরে পূর্বোল্লেখিত রাজতন্ত্র শুরু হয়। এক কিংবদন্তী মতে, চতুর্দশ শতাব্দীতে পূর্বাঞ্চলীয় তিব্বতের খামের মিন্যাক প্রাসাদ থেকে *খে বুমসা* নামে এক রাজকুমার দৈব নির্দেশে ভাগ্যান্বেষণে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করেন। এই রাজকুমারের পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ ফুন্‌সগ নামগিয়াল ১৬৪২ সালে সিকিম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। যুকসোমের তিনজন শ্রদ্ধেয় লামা তাঁকে চোগিয়াল (বা পুরোহিত রাজা) হিসেবে অভিষিক্ত করেন।

ফুন্‌সগ নামগিয়ালের পুত্র তেনসুং নামগিয়াল ১৬৭০ সালে রাজা হন। ইনি যুকসোম থেকে রাজধানী রাবডেনসে (বর্তমান পেলিংয়ের নিকটবর্তী) -য় স্থানান্তরিত করেন। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে চোগিয়ালের সৎবোনের সাহায্যে ভুটানিজরা সিকিম দখল করে। দশ বছর পরে তিব্বতীরা ভুটানিজদের উৎখাত করে চোগিয়ালকে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। ১৭১৭ থেকে ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিমে নেপালিজ ও পূর্বে ভুটানিজদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে রাজতন্ত্র বিপর্যয়ের মুখে পড়ে এবং নেপালিজরা রাজধানী রাবডেনসের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। ১৭৯১ সালে চিন সিকিমের সমর্থনে এবং তিব্বতকে রক্ষা করতে গোর্খা রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। গোর্খাদের উপর্যুপরি পরাজয়ের ফলে চিনা চিয়িং রাজবংশ সিকিমের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

ব্রিটিশ রাজত্বকালে সিকিম

প্রতিবেশী ভারতে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার ফলে সিকিম তাদের অভিন্ন শত্রু নেপালের বিরুদ্ধে লড়তে বিট্রেনের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলে। নেপালিজরা সিকিম আক্রমণ করে তেরাইসহ এর অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয়। এর জবাবে কাল বিলম্ব বা করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নেপাল আক্রমণ করে। যার ফলশ্রুতি ১৮১৪ সালের গুর্খা যুদ্ধ। ১৮১৭ সালে দখলকৃত ভূমি প্রত্যর্পণের শর্তে সিকিম ও নেপালের মধ্যে চুক্তি হয়। পরে মোরাং অঞ্চলে কর আদায় শুরু হলে সিকিম ও ব্রিটিশ বন্ধনে চিড় ধরে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে ডাক্তার স্যার যোসেফ ডাল্টন হুকার ও ডাক্তার আর্কিব্যাল্ড ক্যাম্পবেল নামে দু'জন ব্রিটিশ চিকিৎসক কাউকে না জানিয়ে বেআইনিভাবে সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল ঘুরতে বের হন। ডাক্তার ক্যাম্পবেল ছিলেন ব্রিটিশ ও সিকিমিজ সরকারের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিনিধি। দুই চিকিৎসককে সিকিমিজ সরকার আটক করে। ফলশ্রুতিতে ব্রিটিশ সরকার সিকিমের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যার ফলে ১৮৫৩ সালে দার্জিলিং ও মোরাং ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। এই দখলের ফলে সিকিমের চোগিয়াল ব্রিটিশ গভর্নরের নির্দেশনা মোতাবেক খেতাবি শাসকে পরিণত হন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে চিনের সঙ্গে এক চুক্তির ফলে সিকিম ব্রিটেনের সংরক্ষিত রাজ্যে পরিণত হয়, যদিও চুক্তি সম্পাদনকালে সিকিম বা তিব্বত সরকারের সঙ্গে কোনরকম আলোচনা করা হয়নি। পরবর্তী ৩ দশকে সিকিমকে ক্রমান্বয়ে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন মঞ্জুর করা হয় এবং ১৯২২ সালে সিকিম চেম্বার অফ প্রিন্সেস-এর সদস্য হয়। এই চেম্বার ছিল ভারতের প্রিন্সলি স্টেটসমূহের শাসকদের প্রতিনিধিত্বমূলক এসেম্বলি।

ভারতীয় সংরক্ষণ ও রাজ্যের মর্যাদা লাভ

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদান প্রশ্নে গণভোটে সিকিমের জনগণ যোগদানের বিপক্ষে রায় দেয়। পরে ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী জরহরলাল নেহরুর আগ্রহে ভারত ও সিকিমের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে সিকিম ভারতের সংরক্ষিত রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। সিকিম ভারতের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে আসে।

চোগিয়ালের অধীনে সাংবিধানিক সরকার অনুমোদনের জন্য ১৯৫৩ সালে একটি রাজ্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত ও চিনের সঙ্গে সংযুক্তির চাপ থাকা সত্ত্বেও চোগিয়াল প্যালডেন থোন্ডুপ নামগিয়াল স্বায়ত্তশাসন বজায় রেখে সিকিমকে এশিয়ার মডেল রাজ্যে পরিণত করেন যার সাক্ষরতার হার ও মাথাপিছু আয় প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান ও ভারতের তুলনায় দ্বিগুণ। এদিকে ভারত-সমর্থিত সিকিম জাতীয় কংগ্রেস নতুন নির্বাচন এবং সিকিমে নেপালিজদের অধিকতর প্রতিনিধিত্ব দাবি করে। ১৯৭৩ সালে রাজতন্ত্রবিরোধীরা চোগিয়ালের প্রাসাদের সামনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে।

১৯৭৫ সালে সিকিমের প্রধানমন্ত্রী সিকিমকে ভারতের রাজ্যভুক্তির জন্য ভারতীয় সংসদে আবেদন জানান। ঐ বছরের এপ্রিলে ভারতীয়

রুমটেক বৌদ্ধবিহারের অলংকৃত স্তম্ভ

রুমটেক বৌদ্ধবিহারে নবীন ভান্তের দল

সৈন্যরা গ্যাংটক দখল করে চোগিয়ালের প্রাসাদরক্ষীদের অস্ত্রসংবরণে বাধ্য করে। পরে এক গণভোটে ৯৭.৫ শতাংশ ভোটার রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভোট দেয় এবং ১৬ মে সিকিম ভারতের ২২তম রাজ্যের মর্যাদা লাভ করে। সিকিমে রাজতন্ত্রের বিলোপ ঘটে।

সাম্প্রতিক ইতিহাস

২০০০ সালে দালাই লামার আশীর্বাদপুষ্ট ও চিনা সরকারের টুলকু [তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের পুরোহিত তথা শিক্ষক] হিসেবে গৃহীত সপ্তদশ কর্মাপা উর্গিয়েন ট্রিনলে দরজি সিকিমের রুমটেক বৌদ্ধবিহারে ফেরার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ভারতের প্রতিবাদে চিন মৌনতা অবলম্বন করে। তবে ২০০৩ সালে চিন সরকার সিকিমকে কার্যত ভারতের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, প্রতিদানে ভারত তিব্বতকে চিনের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দান করে। নয়াদিল্লি ১৯৫৩ সালে জওহরলাল নেহরুর আমলে তিব্বতকে চিনের অংশ হিসেবে মূলত স্বীকৃতি দিয়েছিল। যাহোক, ২০০৩ সালের চুক্তির ফলে ভারত-চিন সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে ২০০৬ সালে সিকিমিজ-হিমালিয়ান নাথু লা পাস খুলে দেওয়া হয় আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যের জন্য। ১৯৬২ সালে ভারত-চিন যুদ্ধের পর এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লাথু লা পাস প্রাচীন সিল্ক রোডের অংশ।

২০১১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর সিকিমে ৬.৯ রিকটার মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে যাতে সিকিমসহ নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও তিব্বতে কমপক্ষে ১১৬ ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটে। এর মধ্যে শুধু সিকিমের লোকই ছিল ৬০ জনের বেশি। ভূমিকম্পে গ্যাংটক শহরের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়।

ভূগোল

হিমালয় পর্বতমালার কোলে অবস্থিত সিকিম পার্বত্যভূমিবিশিষ্ট। গোটা রাজ্যটাই পার্বত্যময়। উচ্চতা ২৮০ মিটার (৯২০ ফুট) থেকে ৮৫৮৬ মিটার (২৮ হাজার ১৬৯ ফুট) পর্যন্ত। কাঞ্চনজংঘাশৃঙ্গ পৃথিবীর তৃতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ, রাজ্যের সর্বোচ্চ শিখর– সিকিম ও নেপালের সীমান্তে অবস্থিত। শিলাময় ও ঢালু অধঃক্ষেপের কারণে জমি কৃষিকাজের অনুপযুক্ত। তবে কোন কোন পর্বত ঢালকে চত্বরে রূপান্তরিত করে সেখানে কৃষিকাজ করা হচ্ছে। রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমে অনেকগুলো বরফগলা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। এসব শাখা-প্রশাখা তিস্তা ও এর উপনদী রংগীতের জন্ম দিয়েছে যা রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। রাজ্যের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত। হিমালয় পর্বতমালা সিকিমের উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল বেষ্টন করে আছে। রাজ্যের দক্ষিণে নিম্নতর হিমালয় জনসংখ্যা অধ্যুষিত। রাজ্যে রয়েছে ২৮টি শিখর, ৮০টির বেশি হিমবাহ, সংমো, গুরুডংমার ও খেচেওপাল্‌রিসহ ২২৭টি উচ্চভূমির হ্রদ, ৫টি প্রধান উষ্ণ প্রস্রবণ ও শতাধিক ছোট-বড় নদী। সিকিমের উষ্ণ প্রস্রবণগুলির আয়ুর্বেদিক ও থেরাপিউটিক মূল্য রয়েছে। রাজ্যের ৫টি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উষ্ণ প্রস্রবণ হচ্ছে: ফুরচাচু, যুমথাং, বোরাং, রালাং, তারাম-চু ও যুমে সামডং। নদী তীরবর্তী এসব উষ্ণ প্রস্রবণে উচ্চমাত্রার সালফার বিদ্যমান; কোন কোনটি থেকে হাইড্রোজেন নির্গত হয়। এসব জলের গড় তাপমাত্রা ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (১২২ ডিগ্রি ফারেনহাইট)।

ভূতত্ত্ব

সিকিমের পাহাড়শ্রেণী মূলত নিইসোস ও আধা-সিসটোস পাথরে গঠিত। ফলে নিম্নমানের অগভীর কাদামাটি তৈরি করে। মাটি অমসৃণ এবং আয়রন অক্সাইড মিশ্রিত। মাটিতে অর্গ্যানিক ও খনিজ উপাদান কম, এসিডের পরিমাণ বেশি। এসব মাটি চিরহরিৎ ও পত্রমোচী বনের উপযোগী।

সিকিমের অধিকাংশ এলাকা ক্যামব্রিয়ান-পূর্ব যুগের পাথরে গঠিত, যা পর্বতমালার চেয়ে বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন। ফাইলাইট ও সিস্ট দিয়ে অধিকাংশ পাথর গঠিত ফলে দ্রুত জল শুষে নিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এর সঙ্গে রাজ্যের উচ্চ বৃষ্টিপাত যুক্ত হয়ে ব্যাপক ভূমিক্ষয় ও ধসের সৃষ্টি করে। ফলে নগর কেন্দ্রগুলির সঙ্গে প্রায়শই গ্রামীণ শহর ও গ্রামের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জলবায়ু

সিকিমে ৫টি ঋতু– শীত, গ্রীষ্ম, বসন্ত, হেমন্ত ও বর্ষা। জুন থেকে সেপ্টেম্বর অবধি বর্ষাকাল। সিকিমের জলবায়ু দক্ষিণে আধা-উষ্ণমণ্ডলীয়, উত্তরে তুন্দ্রা। সিকিমের অধিকাংশ জনবসতিপূর্ণ এলাকার জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। গ্রীষ্মে তাপমাত্রা কদাচিৎ ২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৮২ ডিগ্রি ফারেনহাইট)। রাজ্যের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা প্রায় ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৬৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)

সিকিম ভারতের গুটিকয় রাজ্যের একটি, যেখানে নিয়মিত তুষারপাত হয়। উত্তরে ৬১০০ মিটার থেকে দক্ষিণে ৪৯০০ মিটার পর্যন্ত তুষাররেখা বিস্তৃত। উত্তরের তুন্দ্রা ধরনের অঞ্চল বছরের চারমাস তুষারাবৃত্ত থাকে। তখন প্রতিরাতে তাপমাত্রা ০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে যায়। উত্তর-পশ্চিম সিকিমের পর্বতশিখর সারাবছর তুষারাবৃত থাকে, অধিক উষ্ণতার কারণে পর্বতের তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায়।

বর্ষা ঋতুতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ভূমিধসের আশংকা বেড়ে যায়। সিকিমে সর্বোচ্চ ১১ দিন টানা বৃষ্টিপাতের রেকর্ড আছে। শীত ও বর্ষায় রাজ্যের অনেক এলাকা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে, ফলে পরিবহন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে।

কিরাতেশ্বর মহাদেব মন্দির

সিকিমের একটি জলপ্রপাত

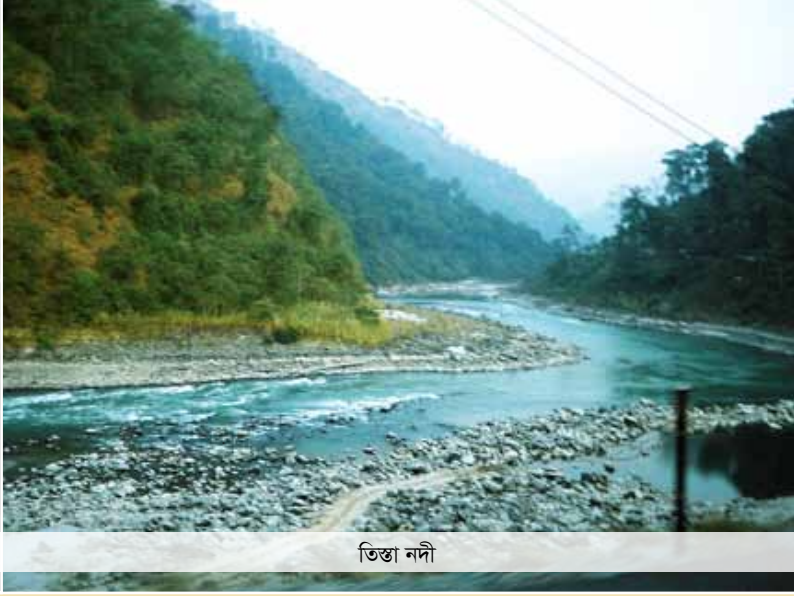

তিস্তা নদী

সরকার ও রাজনীতি

ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী সিকিমে সরকার পরিচালনায় প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক সংসদীয় ব্যবস্থা রয়েছে। রাজ্যের সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। সরকার কাঠামো ৩ শাখায় বিন্যস্ত:

নির্বাহী: ভারতের সকল রাজ্যের মত গভর্নর নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান। কেন্দ্রে যেমন রাষ্ট্রপতি নির্বাহী ক্ষমতার প্রধান। রাষ্ট্রপতি গভর্নর নিযুক্ত করেন। গভর্নরের নিযুক্তি প্রধানত আনুষ্ঠানিক। তাঁর প্রধান ভূমিকা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ পর্যবেক্ষণ। রাজ্য নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বা জোটের প্রধান হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সত্যিকারের নির্বাহী ক্ষমতা ধারণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে গভর্নর কেবিনেট মন্ত্রীদেরকে নিয়োগ প্রদান করেন।

শাসন বিভাগ: এক কক্ষবিশিষ্ট সিকিম বিধানসভায় সংঘর জন্য একটি সংরক্ষিত আসনসহ আসন সংখ্যা ৩২। ভারতের জাতীয় দ্বিকক্ষ লোকসভা ও রাজ্যসভায় সিকিমের একটি করে দুটি আসন রয়েছে।

বিচার বিভাগ: সিকিমের বিচারবিভাগ হাইকোর্ট ও অধঃস্তন আদালতের সমন্বয়ে গঠিত। গ্যাংটকে অবস্থিত হাইকোর্টে একজন প্রধানবিচারপতি সহ দুজন স্থায়ী বিচারপতির পদ রয়েছে। সিকিম হাইকোর্ট দেশের সবচেয়ে ছোট রাজ্য হাইকোর্ট।

সিকিম ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের পবনকুমার চামলিং ১৯৯৪ থেকে একাদিক্রমে এখনও মুখ্যমন্ত্রীর পদে আসীন রয়েছেন। রাজ্যের গভর্নর শ্রীনিবাস দাদাসাহেব পাটিল।

জেলা ও মহকুমা

সিকিমে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে ৪টি জেলা। জেলা সদরদপ্তরের নাম যথাক্রমে গ্যাংটক, গিয়ালশিং, মাঙ্গান ও নামচি। পূর্ব সিকিম জেলার দুই মহকুমার নাম পাকোং ও রংলি, পশ্চিম সিকিম জেলার মহকুমার নাম সোরেং, উত্তর জেলার মহকুমার নাম চুংথাং এবং দক্ষিণ জেলার মহকুমার নাম রাভোংলা।

সিকিমের প্রত্যেক জেলায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিযুক্ত একজন জেলা কালেক্টর আছেন। তিনি জেলার বেসামরিক প্রশাসক। চিনের সঙ্গে স্পর্শকাতর সীমান্ত থাকায় সিকিমের একটি বড় অংশ ভারতীয় সেনাবাহিনির নিয়ন্ত্রণে।

ভারত-চিন সীমান্তের নাথু লা পাস

প্রাণি ও উদ্ভিদ

ভারতের ৩টি প্রতিবেশ অঞ্চলের অন্যতম সিকিম নিম্ন হিমালয়ের একটি প্রতিবেশ কেন্দ্রবিন্দু। বনাঞ্চলে প্রাণি ও উদ্ভিদের ব্যাপক বৈচিত্র্য বিদ্যমান। উচ্চতাগত কারণে রাজ্যে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় থেকে নাতিশীতোষ্ণ, আলপাইন ও তুন্দ্রা জলবায়ুর বিভিন্ন প্রকার গাছপালা দেখা যায়। সম্ভবত কোন ক্ষুদ্র অঞ্চলে এত বৈচিত্র্য আর কোথাও দেখা যায় না। সিকিমের প্রায় ৮১ শতাংশ এলাকা বন দফতরের প্রশাসনিক কাঠামোর আওতাধীন।

সিকিমে প্রায় ৫ হাজার প্রজাতির ফুলগাছ, ৫১৫ প্রজাতির অর্কিড, ৬০ প্রজাতির প্রিমুলা, ৩৬ প্রজাতির রডোডেনড্রন, ১১ রকমের ওক, ২৩ রকমের বাঁশ, ১৬ প্রজাতির কোনিফার, ৩৬২ ধরনের ফার্ন ও ফার্ন গোত্রীয়, ৮ রকমের ফার্ন গাছ এবং ৯ শতাধিক ভেষজ গাছগাছালি রয়েছে। স্থানীয়ভাবে 'ক্রিসমাস ফ্লাওয়ার' নামে পরিচিত এক ধরনের পয়েনসেটিয়া এ পার্বত্যরাজ্যে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পবিত্র *ডেনড্রোবিয়ান* হচ্ছে সিকিমের সরকারি ফুল, রডোডেনড্রন সরকারি গাছ।

সিকিমের নিম্নাঞ্চলের হিমালয় আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বড়পাতার বনে অর্কিড, ডুমুর, লরেল, কলা, শালগাছ ও বাঁশ জন্মে। ১৫০০ মিটারের উপরের নাতিশীতোষ্ণ পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয়ান বড়পাতার বনে ওক, চেস্টনাট, ম্যাপল, বার্চ, অ্যালডার ও ম্যাগনোলিয়া প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ৩৫০০ থেকে ৫০০০ মিটার উচ্চতার হিমালয়ের আধা-গ্রীষ্মমণ্ডলীয় পাইন বনে চির্ পাইন, আলপাইন ধরনের গাছপালা সাধারণত দেখা যায়। অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয়ান সাব-আলপাইন কোনিফার বনে জুনিপার, পাইন, ফির, সাইপ্রেস ও রডোডেনড্রনের দেখা মেলে। পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয়ান আলপাইন গুল্ম ও তৃণভূমি হচ্ছে হরেক রকমের রডোডেনড্রন ও বুনোফুলের জন্মস্থান।

সিকিমের প্রাণিকূলের মধ্যে আছে বরফ চিতা, মুখোশ হরিণ, হিমালয়ান মেষ, লাল পান্ডা, হিমালয়ান মারমট, হিমালয়ান সেরো (শিংবিহীন হরিণ), হিমালয়ান গোরাল, মুন্‌জ্যাক (এক ধরনের হরিণ), লেঙ্গুর, এশীয় কালো ভল্লুক, মেঘচিতা, মারব্লেড বিড়াল, চিতাবিড়াল, বনকুকুর, তিব্বতী নেকড়ে, হগ বাগার[মুকর জাতীয় ভোঁদড়], বিন্টুরং ও হিমালয়ান বনবিড়াল। আলপাইন এলাকায় ইয়াক সচরাচর দেখা যায়– দুধ, মাংস ও বোঝা বহনের জন্য ইয়াক অতি প্রয়োজনীয় প্রাণি।

খেচর প্রাণির মধ্যে ইম্পিয়ান ফিজ্যান্ট, ক্রিমসন হর্নড ফিজ্যান্ট, স্নো পার্ট্রিজ, তিব্বতী তুষার মোরগ, দেড়েল ও গ্রিফোন শকুন এবং সোনালি ঈগল, কোয়েল, প্লোভার, উডকক্, স্যান্ডপাইপার, কবুতর, ওল্ড ওয়ার্ল্ড ফ্লাইকেচার, বাবলার ও রবিন। সিকিমে ৫৫০ প্রজাতির পাখি দেখা যায়, যার মধ্যে কয়েকটি বিলুপ্তির সম্মুখীন।

সিকিম কীটপতঙ্গেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। ভারতীয় উপমহাদেশে দৃশ্যমান ১৪৩৮ প্রজাতির প্রজাপতির মধ্যে সিকিমেই ৬৯৫ প্রজাতি রেকর্ড করা

রুমটেক বৌদ্ধবিহারের অভ্যন্তরভাগ

সিকিম বিধানসভা

হয়েছে। এসবের মধ্যে কাইজার-ই-হিন্দ, হলুদ গর্গন ও ভুটান গ্লোরি হুমকিগ্রস্ত।

অর্থনীতি

সিকিমের ছোট জিডিপি ২০১৪ সালে ছিল ১৫৭ কোটি মার্কিন ডলারের। রাজ্যের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে কৃষিনির্ভর। পাহাড়ি ঢালে করা কৃষিকাজে ধান ছাড়াও ভুট্টা, গম, বার্লি, কমলা, চা ও এলাচ চাষ হয়। সিকিম ভারতের প্রধান এলাচ উৎপাদনকারী রাজ্য এবং সর্ববৃহৎ এলাচ চাষের এলাকা। পার্বত্য উপত্যকা ও পরিবহন অবকাঠামোর অভাবে এখানে বৃহদাকার শিল্প গড়ে উঠতে পারেনি। রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলীয় মেলি ও জোরথাংয়ে ব্রিউয়িং, ডিস্টিলিং, ট্যানিং এবং ওয়াচমেকিংয়ের কারখানা গড়ে উঠেছে। এছাড়া সিকিমে ছোট আকারের খনিশিল্প গড়ে উঠেছে যেগুলি তামা, ডোলোমাইট, ট্যাল্ক, গ্রাফাইট, কোয়ার্জাইট,কয়লা, জিংক ও লেড আহরণ করে। রাজ্যের সামান্য শিল্প অবকাঠামো সত্ত্বেও অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ২০০০ সাল থেকে ক্রমবর্ধমান; শুধু ২০১০-এ রাজ্যের জিডিপি বেড়েছে ৮৯.৯৩ শতাংশ। ২০০৩ সালে সিকিম কৃষিকে অরগ্যানিক ফার্মিংয়ে রূপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২০১৫ সালে 'অরগ্যানিক স্টেট'-এ পরিণত হয়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সিকিম সরকার পর্যটন প্রসারে মনোযোগ দিয়েছে। ফলে ১৯৯০-এর মধ্যভাগ থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যের রাজস্ব বেড়েছে প্রায় ১৪ গুণ। অধিকন্তু সিকিম বিকাশমান জুয়া শিল্পে বিনিয়োগ করেছে, ফলে ক্যাসিনো ও অনলাইন জুয়ার প্রসার ঘটেছে। ২০০৯ সালে রাজ্যের প্রথম ক্যাসিনো 'ক্যাসিনো সিকিম' যাত্রা শুরু করে। পরে সরকার আরো ক্যাসিনোর লাইসেন্স ও অনলাইন বেটিং স্পোর্টস-এর লাইসেন্স দিয়েছে। প্লেউইন লটারি রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

২০০৬ সালে নাথু লা পাস খুলে দেওয়া ভারতের সঙ্গে তিব্বতের লাসার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এটি সিকিমের অর্থনীতিতে বড় ধরনের অবদান রাখছে। ভারত ও চিন সরকারের নানা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও এ পথে দিন দিন বাণিজ্য পণ্যের পরিমাণ বাড়ছে।

পরিবহন

বিমান: বন্ধুর ভূমিরূপের জন্য সিকিমে কোন কার্যকর বিমান বন্দর বা রেলপথ নেই। তবে এবছরের মার্চ মাসে রাজ্যের প্রথম বিমানবন্দর চালু হয়েছে। এর অবস্থান রাজধানী গ্যাংটক থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে। এটি সমুদ্রতল থেকে ৪৭০০ ফুট (১৪০০ মিটার) উচ্চতায় অবস্থিত। সিকিমের নিকটকর্তী কার্যকর বিমানবন্দর হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির কাছে অবস্থিত বাগডোগরা বিমানবন্দর। এটি গ্যাংটক থেকে ১২৪ কিলোমিটার (৭৭ মাইল) দূরে অবস্থিত। বাগডোগরা-গ্যাংটকের মধ্যে বাস সার্ভিস রয়েছে। এছাড়াও এ দুটি গন্তব্যের মধ্যে হেলিকপ্টার সার্ভিসও চালু আছে– ৩০ মিনিটের ভ্রমণ, দিনে একবার, ৪জন করে যাত্রী নিতে পারে। গ্যাংটক হেলিপ্যাড রাজ্যের একমাত্র বেসামরিক হেলিপ্যাড।

সড়ক: জাতীয় মহাসড়ক ৩১এ ও ৩১ শিলিগুড়ি ও গ্যাংটকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছে। সিকিম জাতীয় পরিবহনে বাস ও ট্রাক সার্ভিস রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে বাস, পর্যটন ট্যাক্সি ও জিপ গোটা সিকিম জুড়েই চলে। মেলি থেকে শাখা মহাসড়কটি পশ্চিম সিকিমকে সংযুক্ত করেছে। দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলীয় সিকিমের সঙ্গে কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ের সংযোগ রয়েছে। নাথু লা পার্বত্য পাসের মাধ্যমে তিব্বতের সঙ্গে সিকিমের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে।

রেল: সিকিমের রেল অবকাঠামো নেই। নিকটবর্তী রেল স্টেশন হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি ও নিউজলপাইগুড়ি। পশ্চিমবঙ্গের সেবক থেকে সিকিমের রাংপো শহরের সংযোগ স্থাপনে নতুন একটি সিকিম রেলওয়ে প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। মিরিক থেকে রানিপুল পর্যন্ত আরেকটি রেলওয়ে সংযোগের প্রস্তাব করেছে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়।

অবকাঠামো

সিকিমের রাস্তাঘাটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সেনাবাহিনির একটি সংস্থা 'বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন'-এর ওপর। দক্ষিণ সিকিমের রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত ভাল, এ অঞ্চলে ভূমিধস কম। রাজ্য সরকার ১৮৫৭ কিলোমিটার সড়কপথ রক্ষণাবেক্ষণ করে।

সিকিমের অধিকাংশ বিদ্যুৎ আসে এর ১৯টি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে। ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কর্পোরেশন ও পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া থেকেও কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ আসে। ২০০৬ সালের মধ্যে সিকিমের সকল গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব হয়েছে।

জনমিতি

সিকিম ভারতের কম জনঅধ্যুষিত রাজ্য। ২০১১ সালের গণনায় এখানে

সিকিম মনিপাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

সিকিমের রাজ্যপশু লাল পান্ডা

জনসংখ্যা ৬ লাখ ১০ হাজার ৫৭৭ জন। সিকিম ভারতের সর্বনিম্ন জনবসতিপূর্ণ রাজ্য– প্রতি বর্গকিমিতে মাত্র ৮৬ জন। তবে ২০০১ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১২.৩৬ শতাংশ। লিঙ্গ অনুপাত ১ হাজার পুরুষে ৮৮৯ জন মহিলা। ২০১১ সালে সিকিমে মাথাপিছু আয় ছিল ৮১ হাজার ১৫৯ রুপি (১ হাজার ৩০৫ মার্কিন ডলার)।

ভাষা

সিকিমে নেপালি ৬২.৬%, সিকিমিজ (ভুটিয়া) ৭.৬%, হিন্দি ৬.৬%, লেপচা ৬.৫%, লিমবু ৬.৩%, শেরপা ২.৪%, তামাং ১.৮% এবং ৬.২% মানুষ অন্যান্য ভাষায় কথা বলে।

সিকিমে নেপালি সর্বত্র প্রচলিত ভাষা। অন্যদিকে সিকিমিজ (ভুটিয়া) ও লেপচা বিশেষ বিশেষ এলাকায় চলে। সিকিমের অধিকাংশ জায়গায় ইংরেজি বলা ও জানা লোক আছে। অন্যান্য ভাষার মধ্যে আছে জোংখা, শেরপা, সুনুওয়ার, তামাং, থুংলুং, তিব্বতী ও যাখা।

নৃতত্ত্ব

সিকিমের অধিকাংশ নাগরিক নেপালি নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। দেশীয় সিকিমিজরা ভুটিয়া– এরা চতুর্দশ শতাব্দীতে তিব্বতের খাম জেলা থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। লেপচারা এসেছে আরও পূর্ব থেকে। রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তিব্বতীয়দের বাস। দক্ষিণ সিকিম ও গ্যাংটকে কিছু বিহারি, বাঙালি ও মাড়োয়ারি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে।

ধর্ম

২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী সিকিমে হিন্দু ৫৭.৮%, বৌদ্ধ ২৭.৩%, খ্রিস্টান ৯.৯%, ইসলাম ১.৪% ও অন্যান্য ৩০.৭%।

হিন্দুধর্ম মিকিমের প্রধান ধর্ম এবং জাতিগত নেপালিরা এর চর্চা করে। এখানে অনেক হিন্দু মন্দির আছে। কিরাতেশ্বর মহাদেব মন্দির খুব জনপ্রিয়। এটি যমুনেত্রী, গঙ্গোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ–এ ৪টি ধামের সমন্বয়ে গঠিত।

বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের অনুসারী রাজ্যের ২৭.৩ শতাংশ মানুষ। সিকিমের ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের আগে চোগিয়ালের সময় বজ্রযানী বৌদ্ধধর্ম ছিল রাজ্যধর্ম। সিকিমে ৭৫টি বৌদ্ধবিহার রয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে খ্রিস্টান মিশনারী সাহেবরা লেপচাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে। এরা জনসংখ্যায় ১০ শতাংশ। সিকিমের ইভানজেলিক প্রেসবিটারিয়ান চার্চ খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় দর্শনীয় গির্জা। এছাড়া কিছু বিহারি মুসলমান ও জৈন সংখ্যালঘু আছে।

সংস্কৃতি

লোসার বৌদ্ধ উৎসবের সময় লাচুঙে ঐতিহ্যবাহী গুমপা নাচের চল আছে। সিকিমের নেপালি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দেওয়ালী ও দশেরাসহ সব প্রধান হিন্দু উৎসব উদ্‌যাপন করে। ঐতিহ্যবাহী স্থানীয় উৎসব যেমন মাঘ সংক্রান্তি ও ভীমসেন পূজাও জনপ্রিয়। সিকিমে উদ্‌যাপিত বৌদ্ধ উৎসবগুলির মধ্যে লোসার, লুসং, সাগা দাওয়া, লাবাব দুয়েচেন, দ্রুকপা তেশি ও ভুমচু অন্যতম। লোসারের সময় (তিব্বতী নববর্ষ) অধিকাংশ অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকে। এছাড়া মুসলমানরা ঈদ-উল-ফিতর, মহররম, খ্রিস্টানরা ক্রিসমাস উৎসব পালন করে থাকে।

পশ্চিমা রক ও ভারতীয় পপ গান সিকিমে ব্যাপক জনপ্রিয়। দেশীয় নেপালি রক ও লেপচা গানও সমধিক জনপ্রিয়। সিকিমে ফুটবল ও ক্রিকেট খুব জনপ্রিয় খেলা। এছাড়া হ্যাং গ্লাইডিং ও রিভার র‍্যাফ্‌টিং পর্যটন শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

শিক্ষা

২০১১ সালের হিসেব অনুযায়ী সিকিমে সাক্ষরতার হার ৮৮.২ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ৮৭.২৯ ও নারী ৭৬.৪৩ শতাংশ। সিকিম মনিপাল ইউনিভার্সিটি অফ টেকনোলজিক্যাল সায়েন্সেস প্রকৌশল, মেডিসিন ও ম্যানেজমেন্টের উচ্চতর শিক্ষাদান কেন্দ্র। এছাড়া আছে সিকিম বিশ্ববিদ্যালয়।

রান্নাঘর

সিকিমের রান্না

থুকপা, চাউমিন, থাংথুক, ফাকথু, গ্যাথুক, ওনতন প্রভৃতি নুডলভিত্তিক ডিস সিকিমে খুব জনপ্রিয়। মোমো– ধোঁয়াওটা শবজিভরা ডাম্পলিং, মোষ ও শুয়োরের মাংস সুপের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। বিয়ার, হুইসকি, রাম ও ব্যান্ডি সিকিমে ব্যাপকভাবে চলে। যবভিত্তিক এ্যালকোহলিক পানীয় তোংবা সিকিমে তো বটেই, নোপাল ও দার্জিলিংয়েও খুব জনপ্রিয়। পঞ্জাব ও হরিয়ানার পর ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে সিকিম মাথাপিছু এলকোহল পানে তৃতীয় সর্বোচ্চ।

সংবাদমাধ্যম

সিকিমে ইংরেজি, নেপালি ও হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্র পাওয়া যায়। নেপালি ও কিছু কিছু ইংরেজি সংবাদপত্র স্থানীয়ভাবে ছাপা হয়। তবে হিন্দি ও ইংরেজি সংবাদপত্র শিলিগুড়িতে ছাপা হয়। স্থানীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলির মধ্যে *হামরো সা সা প্রজাশক্তি* (নেপালি সাপ্তাহিক), *হিমালয়ান মিরর*, *সময় দৈনিক*, *সিকিম এক্সপ্রেস*, *সিকিম নাউ*, *কাঞ্চনজংঘা টাইমস্*, *প্রাজ্ঞ খবর* ও *হিমালিবেলা* উল্লেখযোগ্য। এছাড়া দি স্টেটম্যান, দ্য টেলিগ্রাফ, দ্য হিন্দু ও দি টাইমস অফ ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক সংস্করণ এখানে পাওয়া যায়। *হিমালয় দর্পণ* শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত নেপালি ভাষার প্রধান জনপ্রিয় দৈনিক সিকিমে খুব প্রচলিত। রাজধানী ও জেলা শহরগুলোতে ইন্টারনেট ক্যাফে সুপ্রতিষ্ঠিত– ব্রডব্যান্ড সংযোগ খুব সুলভ। ডিশ টিভি, দূরদর্শন ও নেপালি ভাষার চ্যানেল রয়েছে।

সূত্র উইকিপিডিয়া
অনুবাদ মানসী চৌধুরী

ভেষজ

ভারতীয় ভেষজ গাছ-গাছড়া

কৃষিবিদ সিদ্দিকুর রহমান

নয়নতারা

বাংলা নাম নয়ন তারা। সংস্কৃত নামও তাই। ইংরেজরা নয়নতারাকে চেনেন চবৎর ডরহশষব নামে। নয়নতারার বৈজ্ঞানিক নাম Vinca rosea (Catharanthus roseus) এবং পরিবার Apocynaceae.

পরিচয়: নয়নতারা বহু বর্ষীজীবী গুল্ম উদ্ভিদ। গাছ লম্বা দেড় থেকে ৬০ থেকে ৭০ সেমি। পাতা গাঢ় সবুজ ৭/৮ সেমি লম্বা ও ২/৩ সেমি প্রশস্ত। পাতার মধ্যে উপশিরা বিদ্যমান। একে কেউ কেউ পয়সা ফুল আবার অনেকে একে বিস্কুট ফুলও বলে থাকেন। সাদা, গোলাপি, হালকা নীল ও সাদার উপর গোলাপী চোখের নয়ন তারা দেখা যায়। কাণ্ড নরম, রসালো ও গাঢ় সবুজ। ডাল পালা এপাশ ও পাশ ছড়ানো। মূল গুচ্ছ। অস্থানিক। সহজে চারপাশে চড়িয়ে যায়। ফুল সাদা, গোলাপী, সাদার উপর গোলাপী গন্ধহীন তবে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে। ফুলের পাঁচটি পাপড়ি। প্রত্যেকটি পাপড়িই ৩ সেমি পর্যন্ত চওড়া। দলনল সরু, প্রায় আড়াই সেমি লম্বা। ফুল সারা বছরই ফোটলেও শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে বেশি বেশি ফোটে। বীজ কালো ও অমসৃণ। কালো রঙের বীজ থেকে চারা উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার ঘটে। খুবই সহজেই টবে নয়নতারার চাষ করা যায়।

কাজ: নয়নতারা ফুলের গাছে ৬০টিরও বেশি উপকার রয়েছে। এর মধ্যে ভিনক্রিস্টিন ও ভিনবাস্টিন লিউকেমিয়া রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দুইটি secoiridoial glucosides, ursolic acid, oleanolic acid আছে। উচ্চ রক্তচাপে নয়নতারার একটি গাছ ও শুকনো মূলের ১ গ্রাম,কাঁচা হলুদ ২ গ্রাম থেতলে এক কাপ পানিতে সিদ্ধ করে ক্বাথ করে নিয়ে এক চতুর্থাংশ সিদ্ধ কাথ সকাল ও বিকাল দু'বেলা ৮/১০ দিন খেলে রক্ত চাপ কমে। ক্বাথটি ৫/৬ দিন খেলে কৃমির উপদ্রব কমে এবং ১৫/২০দিন খেলে কৃমি থেকে রোগমুক্ত হওয়া যায়। এছাড়া এতে ডায়াবেটিক রোগও নিয়ন্ত্রিত হয়। অথবা, উচ্চ রক্তচাপ রোগে সাত দিন নয়নতারার পাতা খেলে রক্তচাপ কমে। এক্ষেত্রে প্রথম দিন ১ কাপ গরম পানিতে ১টি, দ্বিতীয় দিন এক কাপ পানিতে ২টি, তৃতীয় দিন ৩টি, চতুর্থদিন ৪টি, পঞ্চমদিন ৫টি, সপ্তম দিন ৭টি পাতা দিয়ে গরম পানি খেতে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আসলে আর নয়নতারার পাতা খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

দূর্বা

বাংলা নাম দূর্বা। হিন্দি নাম দূর্বা। ইংরেজি নাম Bermuda grass. বৈজ্ঞানিক নাম Cynodon dactylon Pers. পরিবার/গোত্র Gramineae.

পরিচয়: বহুবর্ষজীবি। বিরুৎ। জানা শুনা আগাছা হিসাবে। কাণ্ড– বহু শাখায়িত। কাণ্ডে পর্বগুলো থাকে স্পষ্ট। চ্যাপ্টা রোমহীন। গিটওয়ালা। লালচে। প্রতি পর্ব থেকে শেকড় গজায়। মাটিতে হেলে দুলে চলে বড় হয়।

পাতা পাতা রেখাকার। কাণ্ডকে পাতার খোল ঢেকে রাখে। গাছের রঙ হালকা সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ। পাতা অল্প রোমযুক্ত। প্রান্ত সূচালো। ফুল-ফুল ধরা কাণ্ড খাড়া,আঙুরের মত পুষ্পমঞ্জরী শাখান্বিত। এর পুষ্পমঞ্জরী ৩টি থেকে ৫টি। পাশের দিকে চ্যাপ্টা। বোঁটা ছাড়া ফুল দুই সারিতে থাকে।

ফল/বীজ– ফুল থেকে ফল ও বীজ হয়। সবুজ রঙের বীজ ছোট চকচকে। ফুল থেকে বীজ উৎপাদন হয়। এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে ফুল ও বীজ পরিপক্ক হয় এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে বীজ থেকে চারা গজায়।

উপকারী অংশ: সম্পূর্ণ অংশ। ট্রাইটারপিনয়েডস, প্রোটিন ও মর্করা থাকে। এছাড়া জৈব এসিড পাওয়া যায়।

ব্যবহার: কাটা স্থানে দূর্বাঘাস বেটে বা দাঁত দিয়ে থেতলে লাগালে সঙ্গে সঙ্গে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়।

কোনভাবেই মেয়েদের ঋতুস্রাব হচ্ছে না এরকম হলে দূর্বাঘাস বেটে এককাপ রস খেলে দারুন উপকার পাওয়া যায়।

- প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এক কাপ দূর্বা ঘাসের রসের সঙ্গে সামান্য আখের রস মিশিয়ে খেলে অশ্বরোগ আরোগ্য হয়।
- দূর্বার কচি ডগা সামান্য সরিষার তেলসহ দাঁতের গর্ত করা স্থানে দিলে জীবাণু মারা যায় ও উপকার হয়।
- পায়ের একজিমা হলে চুলকিয়ে দূর্বাঘাসের রস দিলে কয়েকদিনে ভাল হয়।
- অরুচি, শ্রান্তি, পিত্তদাহ, বমি ও রক্ত দোষ নাশক হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে দূর্বার মূল সমপরিমাণ দূর্বার পাতার রস ও পানি জ্বাল দিয়ে ক্বাথ তৈরি করে ক'দিন খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- মুখের ব্রণ সাড়াতে এককাপ দূর্বার রস এককাপ পুরনো ঘি ভেজে মুখ ধুয়ে লাগালে ব্রণ ভাল হয়।
- একভাগ দূর্বার রস একভাগ তিলের তেল তিনমাস নিয়মিত সপ্তাহে দুই দিন মাথায় দিলে চুলপড়া বন্ধ হয়।
- শরীরের বাত ব্যাথা রোগ হলে দূর্বার রস তার সমপরিমান কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে সমান পরিমাণ দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে ভাল হয়।
- দূর্বা ও আতপ চাল সমান সমান নিয়ে একসঙ্গে বেটে বড়া করে বানিয়ে সপ্তাহে তিন/চার দিন ভাতের সঙ্গে খেলে সুফল পাওয়া যায়।
- দাঁতের পায়োরিয়া সারাতে দূর্বা ঘাসের রস ও দুধ মিশিয়ে দাঁত মাজলে পায়োরিয়া ভাল হয়।

লজ্জাবতী

বাংলা নাম লজ্জাবতী। আবার কেউ কেউ এক বলেন লাজুকলতা। ইংরেজি নাম Sensitive Plant. বৈজ্ঞানিক নাম Mimosa pudica Linn. পরিবার Mimosaceae.

পরিচয়: বর্ষজীবি গুল্ম আগাছা বা ওষুধী গাছ। কাণ্ড লতানো। শাখা প্রশাখায় ভরা। কাঁটাযুক্ত। লালচে রঙের। কিছুটা শক্ত। সহজে ভাঙে না বরং পেঁচিয়ে টানলে ছিড়ে যায়।

পাতা যৌগিক পত্র। কয়েক জোড়া পাতা বিপ্রতীপভাবে থাকে। অনেকটা তেতুল পাতার মত। হাত ও পায়ের স্পর্শে লজ্জাবতীর পাতা বুঁজে এসে বন্ধ হয়ে যায়। পাতা সরু ও লম্বাটে, সংখ্যায় ২ থেকে ২০ জোড়া। উপপত্র কাঁটায় ভরা।

ফুল– উভলিঙ্গ। বৃতির সংখ্যা ৪ টি, পাপড়ি ৪টি, ফুলগুলি বেগুনী ও গোলাপী রঙের।

ফল– দেখতে চ্যাপ্টা এবং একত্রিত। মে থেকে জুন মাসে ফুল আসে, জুলাই আগস্টে ফুল থেকে ফল হয় এবং জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ থেকে চারা গজায়।

উপকারী অংশ: পাতা ও মূল। পাতায় এ্যাকোলয়েড ও এড্রেনালিন এর সব উপকরণ থাকে। এছাড়ও (turgorins) টিউগুরিনস্ এবং মুলে ট্যানিন থাকে।

ব্যবহার: দাঁতের মাড়ির ক্ষত সারাতে গাছসহ ১৫ থেকে ২০ সেমি লম্বা মূল পানিতে সিদ্ধ করে সে পানি দিয়ে কয়েকদিন দিনে ৩ বার কুলকুচা করলে ভাল হয়। সাদা ফুলের লজ্জাবতীর পাতা ও মূল পিষে রস বের করে নিয়মিত খেলে পাইলস্ ও ফিস্টুলায় আরাম পাওয়া যায়।

কৃষিবিদ সিদ্দিকুর রহমান কৃষিবিষয়ক প্রাবন্ধিক

সবার জন্য যোগ

সত্যজিৎ বিশ্বাস

শোন আজ বিশ্ববাসী
কর পতঞ্জলির যোগ চর্চা
এর জন্য যেতে হবে না
ডাক্তার, কবিরাজ, বৈদ্য
সকলের তরে খুলেছি যে দ্বার
আমরা জেনেছি যোগেরই সার
তাই বসেছি যোগ সাধনে
সার্থক হবে সাধ এই জীবনে
যোগেরই প্রভাবে আরোগ্য হবে–
তনু-মন, প্রাণ হবে শক্ত
রাজ কর্ম ভক্তি জ্ঞানম
এই নিয়ে আমাদের যোগ জীবনম্!
আসন মুদ্রা প্রাণায়াম
চর্চার প্রয়োজন মন সংযম
সত্যম্ আনন্দম্ সুন্দরম্
এই নিয়ে আমাদের যোগ জীবনম্
যোগ জীবনম্! যোগ জীবনম্!! যোগ জীবনম্!!!

সত্যজিৎ বিশ্বাস ভারতের যোগগুরু ও যোগ বিশেষজ্ঞ

গুলতি

সুমী সিকান্দার

ধবল ভাতেরা আজ কুচি গুছিয়ে বসেছে
ঝাল ঝাল লাল ঝোলে মাখামাখা হতে বড্ড সুখ।
আহা কি রূপসী ভাত!
খিদেরা আড়ি পেতে শোনে বারোয়।
দফায় দফায় গুলতি ছোড়া গুলতানী
লালজলেরাই শরাফতের গুষ্টি কিলায়।
রাত ফুরোলেও পাত ফুরোয় না মরদের
ছাড়া পেলেই শূন্য উদরে ঘেঁষবে ভাতেরা
সাথে কটা উস্কো শুষ্কো বেগুন পোড়া!
এতক্ষণের রক্তগুলো শক্ত হয়ে থাক
চোখের কাজল তুলে এক চিমটি ঘুমাক
আজ রাতের 'কারিনা'।

নির্ভেজাল বিষ

রমা সরকার

সব সুধা দাও, তোমরা বিষ খাও
এক এক করে আমার কণ্ঠ ভরে
যত শক্তি নিয়ে একাধিপত্য করে
যত আছে সুধামৃত আমায় দাও ॥

যে যেখানে আছো গ্রাম,শহরবাসী
নেচে নেচে এসো,এসো হাসি খুশি।
মরে যাও চুলোয় যাও জাহান্নামে যাও
নিজেকে নিঃশেষ করে অমরত্ব দাও ॥

জন্মেছ ভুলক্রমে নামহীন ঘরে
নুন পান্তায় বাঁচা! দাও শির শূলে
মূল্যহীন জীবন,কি আছে তোমার?
বিষ খাও বিষ,অমর করো আমার ॥

যতসব অপদার্থের দল
যশ হীন প্রাণী, বেনামী ছাবাল
কি আছে পরিচয়? বল দেখি বল!

গাসে বিষ, থালায় বিষ
গাছে বিষ, নিঃশ্বাসে বিষ– ইশ ইশ ইশ
কোথায় যাবি? কি খাবি?
বিষ না খেয়ে কোথায় যাবি? খা বিষ– বিষ

রেখেছি পাত্রখানি ভুল করিনি চালে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও শ্মশান যাত্রা কালে।
যার যত সুধা আছে দিয়ে দাও
নির্ভেজাল বিষ খাও, রসাতলে যাও ॥

বিপন্ন রাখাল

দুলাল সরকার

শরীরের কোথাও এই গল্পগুলো থেকে যায়
কোথাও লুকিয়ে থেকে গল্পগুলো বড় হয়
বড় হতে হতে একদিন শস্যের মুগ্ধতায়
জীবনের অংশ হয়ে নিজস্ব শিহরণের মধ্যে
মৃত্যু নামক এক ছোট গল্পের অনুবাদ শেষে
নামতাগুলো আওড়ে যায় হেমন্তের শিহরণে
ভূলুণ্ঠিত বেদনায় নদী, পাখি, জল ও নীলিমার
সীমানায় বসে মানুষের অন্তর্লীন হাহাকারে
ঘুঘুর ডাকের শব্দে দুপুর বিষণ্ন হলে
ব্যথিত আগ্রহে বসে হিম হিম হৃদয়ের
মায়াবী ব্যথায় শূণ্য প্রান্তরে ওড়ে
শুভ্র বকের ভিরে পায়ে পায়ে জীবন নামের
এক বিপন্ন রাখাল।

একগুচ্ছ পুষ্পরাশি

জহরলাল মজুমদার

এই কথা এখানেই শেষ নয়, নয় পদ্মভাসা জল
এই নয় কোন আহত শিল্পের কান্না, নয় মৃত নদীর আত্মার গান।
এই শুধু তোমার আমার হৃদয়ে লালিত একগুচ্ছ পুষ্পরাশি
যেন ঝরবেই,

আমি বুঝব কি করে যে এখনো ভালবাসি পরস্পরকে?
যারা তোমার উক্তিতে রক্ত দিছে তারা ভালবাসা জানে,
এও আমি জানি।

তবুও এখনো যারা ভালবাসেনি তারা নিতান্তই শিশু, তারা অন্ধ।
আমার জন্মের পূর্বে তুমি ছিলে দশ কোটি মানুষের
এখন আমার যৌবন, এখন তুমি ষোল কোটি মানুষের
এই কোন শোক নয়, নয় অনুতাপ, এই কথা বিজয়ের,
এও আমি জানি।

এই কথা এখানেই শেষ নয়, নয় পদ্মভাসা জল
এই নয় কোন আহত শিল্পের কান্না, নয় মৃত নদীর আত্মার গান।
এখনো কোকিল বলে রক্ত দাও, এখনো শিউলিতলে প্রতিবাদ ঝরে
তবু চেয়ে চেয়ে দেখি তোমার বুকের দুধ শুষে নেয় রাক্ষুসে পিশাচ!
আমরা দেখেই থাকি, ভুলে যাই।

আমি বুঝব কি করে যে এখনো ভালবাসি পরস্পরকে?

ইলিশ আশ্রয়

শাহীন রেজা

ইলিশ হাতে নেমে যাচ্ছে মেয়েটি
তার ফর্সা পায়ে কাঁচা আলতার দাগ
দূর থেকে রক্তের মত লাগছে

মেয়েটি শাড়ি পড়েনি
হলুদ ওড়না ঢাকা থুতনি চিবুক
শুরু দৃশ্যমান দুটি চোখে রাত জাগার চিহ্ন

মেয়েটি কি নদীকে দেখছে
গাবরঙের মত ঘন কালো শরীর?

ধীর পায়ে নামছে মেয়েটি
বলেশ্বরের দেহ ইলিশের ঘরবাড়ি

মেয়েটি আশ্রয় খুঁজছে।

এস্‌রাজ

গোলাম কিবরিয়া পিনু

যেদিন ভ্রমণ করা হবে শুধু সেদিনের জন্য
আগের মতন–
ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে চাই,
গভীর বিস্ময়ে বিদ্যুৎ অনুভূতিতে–
পুনরায় পাঠাব কী সঞ্জীবনীশক্তি!
প্রুফশিট কেটে সংশোধিত হবো
পুনর্লিখিত রূপের মধ্যে
তূর্যসংকেতে– ঘূর্ণনের গতি জেগে ওঠে!
পুনর্গঠিত অনুরণন নিয়ে
তোমার এস্‌রাজ বাজাব এবার।

মৈত্রেয় মশায়

অনীক মাহমুদ

[অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় স্মরণে]

বেহিসাবি বিকেলের উদোম শরীরে ধুতি-পাঞ্জাবি পরিধেয়
আজকাল সকাল সন্ধ্যার চেষ্টাচারিত্রে কৃচিৎ দেখা যাচ্ছে
রাত্রি বাহাদুর চাঁদ ধরে পকেটে পুরছে
জোনাকি বাগানে ছেড়ে দিচ্ছে অন্ধকার কাঠুরে ঝিঞ্জিট
প্রত্যুষার হাতে পেস্টব্রাশ নিশান্তক ভাদ্রবধুর মতন
হুতোমের গলা খাঁকারিতে বিমুখ লজ্জার হাড়িকাঠে
সামলে নিতেই উতানির ছলনা হজম করে যাচ্ছে,
আমাদের বেপরোয়া অথচ শান্ত মহানগর ঝিম মেরে
খোঁয়ারির আশ্লেষে কেমন মন্ত্র জপে যাচ্ছে!
আড়মোড়া দিচ্ছে যেন বিড়বিড়ে দেয়াশিনী
অনেকটা আত্মসুখকামী দোসরতা বুকে পুষে
হাঁক দিচ্ছে 'চাচা আপন পরান বাঁচা'।
মৈত্রেয় মশায়, কৃতজ্ঞতা কেমন গুমরোমুখো কলহান্তরিতা
অসূয়ার নাতাকানি পরে অভিমানে রাগে ও দুক্ষোভে
বসে ঝাল ঝাড়ছে একাকী দ্বিপ্রহর,
ঐতিহ্যের ঝল্ল কণ্ঠি গলায় রগড়ে সোনাঝরা রোদের মাহাত্ম্য
ক্রমেই হারাচ্ছে নিরুপম সৌহার্দের নরোম যৌবন,
মৈত্রেয় মশায়, একবুক বিশ্বাসের সিক্রেটিন অনুপানে
আপনিই সিরাজের কলঙ্ক মোচনে হয়েছেন অগ্রবর্তী
যুক্তিবন্ত ইতিহাসে সাহসী নকিব,
আপনিই ফিরিঙ্গি বণিক তস্য দানবের আঁতের কথাও
লিখে দিয়েছেন অমিত সাহসে–
বরন্দ্রের প্রত্ন প্রতিমার মণিকুট্টিম মঞ্জুল জাদুঘর
আপনারই যাজ্ঞিক সাধনা যশস্বান কীর্তিলতা,
আজো এ নগর অতীতের সহযোদ্ধা কলমের খাঁজে খাঁজে
বিলাচ্ছে তারই অনুপম দিনের বৈভব,
মৈত্রেয় মশায়, আপনার শ্রমঘামে যে মৃত্তিকা পেয়েছিল ভিন্নমাত্রা
প্রজন্মের ধারাস্রোতে বিস্মৃতির রুদ্রলীলা জুড়ে
বারবার এড়াতে চেয়েছে সব রকমের দায়দীক্ষা
তবু ভোলানাথ মহাযোদ্ধা মহাকাল সারথির অদম্য নৈপুণ্যে
মাঝে মাঝে ছড়িয়ে বেড়ায় উলুবনে মুক্তোর সংবেদ
এটুকুই জ্ঞানযোগ অক্ষয় প্রত্যয়!
বিশ্বাসের তরুমূলে মৈত্রেয় সান্ত্বনা!

প্র.না.বি. প্রমথনাথ বিশী

প্র.না.বি. নামে সমধিক খ্যাত শিক্ষাবিদ ও অধ্যাপক, কবি ও সাহিত্যসমালোচক নাট্যকার ও রম্যরচয়িতা প্রমথনাথ বিশীর জন্ম ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১১ জুন অবিভক্ত বাংলার রাজশাহীর নাটোর জেলার জোয়াড়ি গ্রামে। জমিদার পরিবারে জন্ম। পিতা নলিনীনাথ বিশী ও মাতা সরোজবাসিনী দেবী। স্ত্রী সুরুচি দেবী। তিনি ১৯৬২-৬৮ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন।

তাঁর বাল্য ও কৈশোর কাটে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে শান্তিনিকেতনে। তিনি ১৭ বছর শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে পড়াশুনো করেন। সেখান থেকে ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সেখানে এক নাগাড়ে সতের বছর অধ্যয়ন। মেধা, প্রখর বুদ্ধি, অধ্যয়ননিষ্ঠা, কবি-প্রতিভা ইত্যাদি গুণাবলির জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের স্নেহ লাভ করেন। এরপর ১৯২৭ সালে আইন এবং ১৯২৯ সালে ইংরেজিতে অনার্সসহ বিএ পাশ করেন রাজশাহী কলেজ থেকে। ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এমএ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি সম্ভবত প্রথম প্রাইভেট ছাত্র যিনি 'রেকর্ড মার্কস্'সহ প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। এরপর তিনি রামতনু লাহিড়ী বৃত্তি পেয়ে গবেষণা সম্পন্ন করেন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত কলকাতার রিপন কলেজে বাংলায় অধ্যাপনা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্র-অধ্যাপক এবং বাংলা বিভাগের প্রধানের পদ অলংকৃত করেন।

১৯৩১ সালে তিনি শান্তিনিকেতন পত্রিকা সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন। এই অভিজ্ঞতা উত্তরজীবনে তাঁর প্রভূত কাজে লাগে। ১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে তিনি রিপন কলেজে অধ্যাপনা পেশায় যোগ দেন। এসময় তাঁকে দু'টি পেশার পার্থক্য বিচার করতে বলা হলে তিনি একটিমাত্র বাক্য বলেছিলেন– 'শিক্ষকতা হচ্ছে পণ্ডিতের মূর্খতা আর সাংবাদিকতা মূর্খের পাণ্ডিত্য।'

১৯৬২ থেকে '৬৮ সাল অবধি তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হিসেবে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দেন। এরপর ১৯৭২ সাল থেকে '৭৮ পর্যন্ত রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হয়ে দিল্লি বাস করেন। *লালকেল্লা* তাঁর এসময়ের অভিজ্ঞতার ফসল। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, সমালোচনা, রম্যরচনা প্রভৃতি সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন।

প্রমথনাথ ১৯৬০ সালে কেরী সাহেবের মুন্সী উপন্যাসের জন্য *রবীন্দ্র পুরস্কার* লাভ করেন। এরপর ১৯৬১ সালে *প্রফুল্লকুমার স্মৃতি পুরস্কার*, '৮১ সালে *শরৎ পুরস্কার*, '৮২ সালে *বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার* এবং '৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান *জগত্তারিণী স্বর্ণপদকে* ভূষিত হন। এছাড়া ১৯৭১ সালে ভারত সরকার তাঁকে *পদ্মশ্রী* উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর বহুল পঠিত উপন্যাসের মধ্যে *জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার*, *অশ্বত্থের অভিশাপ*, *কেরী সাহেবের মুন্সী*, *লালকেল্লা*, *বঙ্গভঙ্গ* উল্লেখযোগ্য। গল্পগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্ব*, *ষষ্ঠ পর্ব*, *অশরীরী*, *গল্পের মতো*, *গালি ও গল্প*, *ধরেপাতা*, *ব্রহ্মার হাসি* ইত্যাদি। নাটকের মধ্যে *ঋণং কৃত্যা*, *ঘৃতং পিবেৎ*, *মৌচাকে ঢিল* প্রভৃতি। তাঁর কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে *দেয়ালী*, *বিদ্যাসুন্দর*, *বসন্তসেনা*, *প্রাচীন আসামী হইতে*, *যুক্তবেণী*, *হংসমিথুন*, *উত্তর মেঘ* প্রভৃতি। তাঁর রচনাসম্ভার বিপুল এবং বিচিত্র।

নিজের সাহিত্যিক সত্তা সম্বন্ধে প্রমথনাথের একটি স্পষ্ট দৃঢ়মূল মতামত ছিল। একবার শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ বসুর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'বাপু হে! আমার ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, যা চাইবে সব পাবে। তোমরা যাকে 'অলরাউন্ডার' বল আর কি? আরে, সেইটাই তো সমালোচকদের আর সাহিত্যিকদের রাগের কারণ। আমার গায়ে কোন লেবেল লাগাতে পারে না। কি বলবে আমাকে– কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, সমালোচক, হাস্যরসিক? ...তোমাকে চুপিচুপি বলি, অনেকরকম লিখি বলে– যে সব সাহিত্যিক একটার বেশি ধরনে লিখতে পারে না, তারা আমার উপর বেজায় চটা।'

নিজের সাহিত্যিক সত্তা সম্বন্ধে অন্তিম অনুশাসনে পুত্রকন্যাদের উদ্দেশে তিনি লেখেন, 'আজকাল দেখিতেছি কোন সাহিত্যিকের মৃত্যু হইলে তাহার স্ত্রী পুত্রকন্যা ও নিকট আত্মীয়গণ তাহার স্মৃতিরক্ষার্থ উঠিয়া পড়িয়া লাগে। হয়ত বসতবাড়ির অংশবিশেষ সাহিত্যিকের নামে অমুক পরিষৎ, অমুক স্মৃতিমন্দির প্রভৃতি রাখে। সংবাদ-পত্রাদিতে তদ্বির করিয়া জন্মদিন বা মৃত্যুদিন উপলক্ষ্যে সভা করিয়া বহু উপরোধ করিয়া বক্তা সংগ্রহ করে, গায়ক সংগ্রহ করে এবং স্মৃতিরক্ষার নামে একটা তামাসা করে। কিংবা একটা বক্তৃতামালা ও পদক ঘোষণা করে। অথবা একটা রাস্তা বা পার্কের নাম বদল করিয়া সাহিত্যিকের নামে নামকরণ করিবার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোরাঘুরি করে।

তোমরা কখনও এরকম দীনতা প্রকাশ করিবে না। কখনো না, কখনো না, কখনো না। আমি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার আশায় কখনও দীনতা প্রকাশ অর্থাৎ তদ্বির তদারক অনুরোধ উপরোধ করি নাই, তোমরাও করিবে না।...'

অসম্ভব রসিক মানুষ ছিলেন তিনি। পরস্পরকে বই উৎসর্গ করা কিংবা দান করা আমাদের সাহিত্যিক মহলের একটি রেওয়াজ। যাঁরা দেন তাঁরাও জানেন যে সময়াভাবে হয়তো এই বইয়ের রসাস্বাদন সম্ভব হবে না প্রাপকের, তবু সৌজন্য রক্ষার দায় বলে একটা কথা আছে। শ্রীভবতোষ দত্তকে একটি বই উপহার দিয়ে প্রমথনাথ লিখেছিলেন–

'দানে পাওয়া বই পড়ে না কেহই
তবু দিই সেটা স্বভাবদোষ।
নাহিক নালিশ হবে তো বালিশ
দয়া করে নিন শ্রীভবতোষ।'

১৯৮৫ সালের ১০ মে কলকাতার রামকৃষ্ণ সেবাসদনে 'ইকোলাই' ইনফেকশনে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন।

● নিজস্ব প্রদায়ক

ভারতীয় হাই কমিশনে যোগ ক্লাশ...

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭ পালনে ভারতীয় হাই কমিশন বারিধারার নতুন চ্যাঞ্চেরি কমপ্লেক্সে এক বিশেষ যোগ ক্লাশের আয়োজন করে। যোগগুরু শ্রী সত্যজিৎ বিশ্বাসের পরিচালনায় এ সাপ্তাহিক যোগ ক্লাশের ঢাকার বিশিষ্টজনেরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন।

সাপ্তাহিক যোগ ক্লাশ স্বাস্থ্যবান ও কর্মক্ষম থাকার এবং নতুন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের একটা বড় সুযোগ। জুলাইয়ে yoga@ihcdhaka-র নতুন পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে শিগগিরই ঘোষণা আসছে...

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra June 2017

सत्यमेव जयते

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

সামঞ্জস্য ও শান্তির জন্য যোগ

সাদর আমন্ত্রণ

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০১৭

তারিখ : ২১ জুন ২০১৭, বুধবার
সময় : সকাল ৫:৩০টা থেকে
স্থান : বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম
গেইট নং ১, ৫, ১৫

বিনামূল্যে

যোগ ম্যাট, টি-শার্ট ও সৌজন্যমূলক উপহার

স্পনসর : State Bank of India, Coca-Cola, marico, শেলটেক SHELTECH PRIVATE LTD

Website: www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka; /HCIDhaka